শতবর্ষে *সবুজ পত্র*

মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম*

সবুজ পত্র (১৯১৪) আর প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)—এ দুই ভিন্ন বিষয়কে এক ও অভিন্ন সত্তা বলায় ক্ষতি নেই। দুইয়ের মূল আসলে এক। কারণ প্রমথ চৌধুরীর আত্মপ্রকাশের জন্যে *সবুজ পত্র* ছিল অনিবার্য। আবার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এ পত্রিকার যে ঐতিহাসিক মূল্য তার কৃতিত্বের কেন্দ্রে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অমলেশ ত্রিপাঠী (১৯২১-১৯৯৮) আলংকারিক ভাষায় বলেন, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন *সবুজ পত্র*-এর 'প্রাণভ্রমর'। (ত্রিপাঠী, ১৯৯৩ : ৩২) কাজেই এ পত্রিকার কথা বলতে গেলে প্রমথ চৌধুরী আসবেন, অপরদিকে প্রমথ চৌধুরীর কথা তুললে *সবুজ পত্র*-এর কথা উঠবে। যেমন *বঙ্গদর্শন* (১৮৭২)-এর কথায় আসেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৬), *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* (১৮৪৩) প্রসঙ্গে আসেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬)। কেননা তাঁরা এই সাময়িক পত্রিকাগুলির মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন, ভিত্তি দিয়েছিলেন বাঙালির নতুন আত্মপরিচয়ের, আশা জাগিয়ে তুলেছিলেন বাঙালির মনে। নতুন ভাষার ক্ষেত্রে, নতুন ভাবের ক্ষেত্রে, নতুন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে, নতুন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে তাঁদের সম্পাদিত এই পত্রিকাগুলির তুলনা হয় না। এগুলি যে কেবল নতুন আদর্শের ভিত্তি ছিল, শুধু তাই না, বাঙালির নতুন জীবনের স্বপ্নে ও আকাঙ্ক্ষায় এসবের মহত্তম অবদান নিত্য স্মরণযোগ্য হয়ে আছে।

এই পত্রিকাগুলির একটির সঙ্গে অপরটির হয়ত তুলনা চলে না। কেননা স্বতন্ত্র মেজাজে, কতকগুলি মৌল বৈশিষ্ট্যে প্রত্যেকটি পত্রিকা ছিল বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল। কিন্তু সে-সবের ধারা আলাদা ছিল না। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি অভিন্ন সুরের ঐক্যে দীপ্ত ছিল এদের প্রাণধর্ম। এ ধর্মে একটি অপরটির আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা পৌঁছে দিয়েছে প্রজন্মান্তরে ও কালান্তরে। ভাষার বিকাশে ও সৃজনশীল সাহিত্যে প্রত্যেকটি পত্রিকা ছিল এক-একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই তিনটি পত্রিকাই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সঙ্গে নবীন ইউরোপীয় বিচার-বুদ্ধির মহাসম্মিলন ঘটিয়েছিল। পত্রিকাগুলি নতুন ও পুরাতন কোনো সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্মরণ করতে ভুল করেনি—আলস্য করেনি ক্লাসিকচর্চায়, পরিচয় নিতে কুণ্ঠিত হয়নি অতীতের নানা বিদ্যার। জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের বাস্তব জীবনের সামঞ্জস্য খুঁজে দেখার প্রয়াসপরতা বিস্ময়কর ছিল এসব পত্রিকার।—এক কথায় পত্রিকাগুলি মানবজ্ঞানের কোনো সীমানা মানতে চায়নি। তার কারণ, এ পত্রিকাগুলির যাঁরা সম্পাদক ও লেখক ছিলেন তাঁরা কেউই কেবল একটি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। আর সাহিত্য বলতে তাঁরা শুধুই গল্প-উপন্যাস বুঝতেন না, বুঝতেন না কেবল মতবাদগত জ্ঞানের চর্চা। মানুষের জ্ঞান-বিদ্যার সমস্ত উপাদান ও উপকরণের প্রতি ছিল তাঁদের সমান আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। তাঁদের কর্ম ও চিন্তার ধরন থেকে বোঝা যায়, তাঁরা জাতীয় জীবনকে বাড়িয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল।

তুলতে চেয়েছিলেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মনুষ্যেতর অবস্থা থেকে মনুষ্যত্বের দিকে।

১

এসব কারণে, আজ শতবর্ষ পরে *সবুজ পত্র*-এর কথা বলতে গেলে শুরুতেই বলতে হয় প্রমথ চৌধুরীর কথা। কেননা তাঁর মন ও চরিত্রের প্রতিফলনই ছিল *সবুজ পত্র*-এর বিশেষত্ব। দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়া যাক আলোচনাটি। প্রথমে প্রমথ চৌধুরীর কথা, পরে *সবুজ পত্র*। অল্পকথায়, প্রমথ চৌধুরীর মনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর কীর্তির পরিচয় নেওয়া কঠিন নয়। অবশ্য কীর্তিমান মানুষের মন ও চরিত্র আলাদা সত্তা নয়। তাঁদের কীর্তির মধ্যেই তাঁদের মন ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর কীর্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন চলিত গদ্যের প্রবর্তক। আরো নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই বলে যে, বাংলা 'গদ্য রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৫) তিনি বাক্‌চতুর ও রচনাকুশল গদ্যশিল্পী। তাঁর চলিত গদ্যের 'অধিনায়কত্ব' ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন *সবুজ পত্র* পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল' ও 'ভূপেন্দ্রনাথ মৈত্র'।[১] লেখক ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি বিশেষ ধারার গদ্যরীতির নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি কলাকৈবল্যবাদী বা 'শিল্পের জন্যে শিল্প' মতের অনুসারী।

অপর তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য। *সবুজ পত্র*-এর প্রবর্তনায় যে গদ্যভাষা তৈরি হয়, ব্যতিক্রম ছাড়া তা সমকালের[২] এবং পরবর্তীকালের প্রায় সকল লেখকই গ্রহণ করেছিলেন। তখন সবুজপত্রগোষ্ঠীর বাইরেও যে এ ভাষা চালু হয়েছিল, সে-সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী, ১৯১৮র ২৬ ডিসেম্বর এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আমি কতটা কৃতকার্যও হয়েছি। চলতি ভাষার আদর যে দিন দিন বাড়ছে সে বিষয়ে আর চোখবুজে থাকা চলে না। চলতি ভাষার পক্ষে যোদ্ধার দল নিত্য বেড়ে যাচ্ছে — তা ছাড়া এ দল চারদিকে তাদের অধিকার বিস্তার করছে; মাসিকপত্র মাত্রেই এখন বাংলা ভাষাকে তাদের বক্ষে স্থান দিতে বাধ্য হচ্ছে। আর এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে নতুন লেখকদের মধ্যে যারা ভাল লেখক তারা এই ভাষাতেই লিখছে। (হারীত, ১৯৯৭ : ১৯৬)

শুধু তাই নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এই গদ্যের প্রভাব অনুপ্রেরণা হিসেবে নিয়ে তার গতি ও সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এ বিষয়ে লিখেছেন,

> রবীন্দ্রনাথ ও চৌধুরী মহাশয়ের পারস্পরিক প্রভাবের ঘাত-প্রতিঘাত বাংলা গদ্যের ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের বয়োকনিষ্ঠ এমন-কোনো লেখক নেই যাঁর উপর তাঁর প্রভাব না পড়েছে, কিন্তু বয়োকনিষ্ঠ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন একমাত্র প্রমথ চৌধুরী। (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ১৫)

এ প্রসঙ্গে হারীতকৃষ্ণ দেবের (১৮৯৪-১৯৬৬) কথাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'সবুজ পত্র বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার প্রয়োগে যে-পথ নির্দেশ করেছিল, সে-পথে

রবীন্দ্রনাথ চলেছিলেন প্রমথবাবুর অনুসরণে। এখানে *পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ঃ* বচনটি সার্থক হয়েছিল।' (হারীত, ১৯৯৭ : ৩০) প্রমথ চৌধুরী ও *সবুজ পত্র* নিয়ে এ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে, গড়পরতা সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির কাছে উল্লিখিত আলোচনা ও পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে এবং সর্বক্ষেত্রে এসবের বিচার-বিশ্লেষণকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৩] প্রমথ চৌধুরীর এইসব পরিচয়কে মান্যতা দিয়ে, তাঁর প্রবর্তিত ভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে, যথাসম্ভব পূর্বমূল্যায়নের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে, *সবুজ পত্র*-এর শতবর্ষে, এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা যোগ করা যায় কি না, আলোচ্য প্রবন্ধের তাই প্রধান উদ্দেশ্য।

২

প্রমথ চৌধুরীর কথা মনে করতে গেলে রবীন্দ্রনাথও এসে পড়েন। সেটা স্বাভাবিক। কারণ প্রমথ চৌধুরী নিজেও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'দীর্ঘকাল তাঁর ছায়াতেই মানুষ হয়েছি।' (প্রমথ, ১৯৫৩ : ৫) এই ছায়া কিভাবে প্রমথ চৌধুরীর ওপর কার্যকর হয়েছিল, তা অনেকেরই জানা। তবু আর একবার স্মরণ করে নেওয়া ভালো। বুদ্ধদেব বসু সাক্ষ্য দিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রমথ-প্রীতির সীমা ছিলো না।' (বুদ্ধদেব, ১৯৯৭ : ২২) কেন? বুদ্ধদেব বসুর মতে, রবীন্দ্র-সান্নিধ্য এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিপূর্ণ পান করেও প্রমথ চৌধুরী আত্মহারা হননি। রবীন্দ্রনাথের অনুকূল থেকেছেন কিন্তু অনুরূপ হননি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মুগ্ধতা, শ্রদ্ধা ও ভক্তির খামতি ঘটেনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে তাঁর মন ওঠেনি। তাঁদের পারস্পরিক বন্ধুত্বে কোনো দিন চিড় ধরেনি। অমলিন সেই সম্পর্কের মধ্যেও দুজনের বিশ্ববীক্ষায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বের এই ভিন্নতর সুরের মধ্যে যে মাধুর্য ও সৌজন্য[৪] প্রকাশিত হয়, তা বাঙালির সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করে। বাঙালি জীবনে এই শিক্ষা দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর *গল্পসংগ্রহ*-এর ভূমিকায় লিখতে গিয়ে বলেছেন, 'যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা।' (রবীন্দ্র, ১৪১২ : ৯) প্রমথ চৌধুরীর লেখালেখির সঙ্গে পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষ্য থেকে এ ধারণা করতে বাধা নেই যে, প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধি ছিল সুস্থির, আবেগ ছিল উত্তাপহীন, লক্ষ্য ছিল বিষয়ভেদী। বাক্যে সংযম, রুচিতে সৌন্দর্য, চিন্তায় পরিচ্ছন্নতা, তথ্যে অভ্রান্তি প্রমথ চৌধুরীর মন ও চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, এ হচ্ছে শুদ্ধ বুদ্ধি ও ভাবুক মনের ক্লাসিক গুণ। প্রমথ চৌধুরীর এসব গুণে মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

> আমি অনেক সময় খুঁজি সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাত ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড় করে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ করে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারেনি তাদের আমি অশ্রদ্ধা করে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়, —এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত্ত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের

> সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি—তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন, তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জনা হতে রক্ষা পেত। এত বেশী নির্বিকার তাঁর মন যে, বাঙ্গালী পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারেনি; মুশকিল এই যে, বাঙ্গালী কাউকে কোনো একটা দলে না টানলে তাকে বুঝতেই পারে না। (প্রমথ, ১৯৯০ : ১৬৭-৮)

প্রমথ-মনীষার কেন্দ্রে ছিল অনন্যসাধারণ ভাবুকতা। রবীন্দ্রনাথ সেটাকে অত্যন্ত প্রসন্ন মনে, গভীর অনুরাগ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে, একবার নয়, বহুবার স্বযাচিতভাবে বলেছেন, প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জিত আভিজাত্য' এবং 'ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন' 'মননধর্ম' তাঁকে বিস্মিত করেছে। এর থেকে প্রমথ চৌধুরীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁকে বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষী ও সাহিত্য-ভাবুকের মর্যাদা দিয়েছে।

৩

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক পরিচয়ের একটা মূল্যবান দিক ছিল তাঁর বহু-বিচিত্র জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ। দেশের এবং বিদেশের, প্রাচীন এবং নবীন সভ্যতার ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, শিল্প ও সাহিত্যের সমঝদারিত্বে তাঁর মন সজীব ও আলোকিত হয়ে উঠেছিল। অপর দিকে, সমাজজীবনে তিনি সব কিছুর ওপরে স্থান দিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক মনোভাবকে। দেখা যায়, ইতঃপূর্বে মুদ্রিত অধিকাংশ আলোচনায় সর্বতোভাবে এই মনোভাবকে উপেক্ষা করা হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর লেখালেখি কম থাকতে পারে কিন্তু তাঁর এইসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে তিনি যে বলেছিলেন, 'বাংলার ভবিষ্যৎ ও বাঙালির ভবিষ্যৎ মূলে একই বস্তু।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৪১)—এ কথার অর্থ কী? বাংলার উন্নতি যে বাংলার জনসাধারণের শক্তির ওপর নির্ভর করছে, এই হচ্ছে ও-কথার আসল তাৎপর্য। আর বাংলার জনসাধারণ হচ্ছে সেই শ্রেণি যার অধিকাংশই কৃষক। অবশ্য এই শ্রেণির কথা তাঁর রচনায় ব্যাপক ও গভীর হতে পারেনি, যেমন হয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষ্যে। কিন্তু 'রায়তের কথা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যা বলেছিলেন, তার সোজা অর্থ, কৃষকের মুক্তির কথা।[৫] দুটো মূল কথা ছিল ও-প্রবন্ধে। তার মধ্যে একটি এই যে, তিনি বলেন, 'আমি জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোনো তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়?' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৮৫) কাজেই এ ব্যাপারে তাঁর আবেদন ছিল :

> বাংলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠাবাড়ি করবার, কুয়ো খোঁড়বার অধিকার পায়, এবং সেইসঙ্গে তার জোত মৌরসী-মোকাররি হয়, তা হলে সে ইংরেজিতে যাকে বলে peasant proprieter তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য যে কতদূর বেড়ে যায় তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্তমান রাশিয়া। যাঁরা বলশেভিজমের ভয়ে কাতর তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাংলার রায়তকে বাংলার peasant proprieter করবার জন্য তৎপর হোন। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৮৮)

কেননা 'বাংলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে। বাংলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৭৮) 'রায়তের কথা'র এই ছিল প্রথম তত্ত্ব। দ্বিতীয় তত্ত্ব ছিল :

> আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে সে হচ্ছে মানবজমিন। আর আমরা যদি স্বদেশের সোনা ফলাতে চাই, তা হলে আমাদের সর্বাগ্রে কর্তব্য হবে এই মানবজমিনের আবাদ করা। এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের মনে রস ও দেহে রক্ত, এ দুই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে তার সাহায্য নিতে হবে।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৭৮)

এর জন্যে চাই শিক্ষা। কারণ

> শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে, তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। নিজের দাসত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়াই মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। অজ্ঞতার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তির পথ যে জ্ঞানমার্গ, এ সত্য বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে, আশা করা যেতে পারে যে, আমাদের প্রজাসাধারণের মনের আবহাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের স্যানিটেশন বই আর কিছুই নয়। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৮৪)

শিক্ষিত বাঙালির গণতান্ত্রিক মনোভাবের ওপর উল্লিখিত দুই তত্ত্বের মীমাংসা ও প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে। আর এই শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে আছেন দু-ধরনের বিদ্বান, বুদ্ধিমান অর্থাৎ প্রভাবশালী মানুষ। এক—রাজনীতিক, দুই—সাহিত্যিক। উল্লিখিত দুই তত্ত্বের সুরাহা করতে হলে এই দুই মানুষকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কেননা সমাজ পরিবর্তনে তথা বাংলার ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে এঁদের ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন, রাজনীতিকের কাজ জনসাধারণের দেহের স্বাস্থ্য পরিবর্তন আর সাহিত্যিকের কাজ জনসাধারণের মনের উন্নতি-সাধন। রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, 'বর্ত্তমান রাজনীতির মূল কথাগুলির জন্ম যদিচ ইউরোপে হয়েছে; কিন্তু তা সকল দেশের সকল মানবের প্রাণের কথা, কেননা যেখানেই মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে—সেখানেই স্বাধীনতা ও সাম্যের ধর্ম্ম মানুষের মনকে অধিকার করে বসবে।' (*সবুজ পত্র*, ১৩২৫ : ৫৫৪) 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজম' প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, 'ডিমোক্রাটিক স্বরাজ্য লাভ করতে হলে আমাদের মনের' পরিবতন দরকার। কেননা 'মানুষকে মানুষ জ্ঞান' করা ভিন্ন 'পৃথিবীর ডিমোক্রাটিক জাতিদের মতো রাজনৈতিক জগতে স্বরাট' হওয়া অসম্ভব। এই ছিল তাঁর রাজনৈতিক মতের চুম্বকসার। এখন নেওয়া যাক তাঁর সাহিত্যিক মনোভাবের সংবাদ।

৪

প্রমথ চৌধুরীর বিদ্যাবত্তা ও জানাশোনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি মনে করতেন, প্রমথ চৌধুরী 'পড়াশুনো ক'রেছেন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।' (রবীন্দ্র, ১৩৭৯ : ১৪৫) প্রমথ চৌধুরীর নিজের কথা থেকেও রবীন্দ্রনাথের ধারণার প্রমাণ মেলে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী নিজেকে 'সাহিত্যরাজ্যে সর্ব্বভুক লোক' (প্রমথ, ১৯৯১ : ৩) বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই রুচিবোধ তাঁকে

বাঙালির সাহিত্যিক অর্জন ও ঐতিহ্যের উচ্চতা বুঝতে সহায়তা করেছিল। বাঙালির সাহিত্যিক অর্জনে তিনি অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী ছিলেন। এই ব্যতিক্রম ছাড়া, তিনি বাঙালির দুর্বল চিন্তায়, অনাত্মচেতন নৈতিকতায়, শিথিল বুদ্ধির প্রয়োগে বিশ্বাস রাখতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, 'আমাদের মত অসহায় ও নিরুপায় জাত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।' (প্রমথ, ১৯৯০ : ৫৬) অন্য এক চিঠিতে বলেন, 'জীবনের বিষয়ে আমাদের মতো নিঃস্ব জাতি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।' (হারীত, ১৯৯৭ : ১৮১) সমাজবিষয়ক গভীর আলোচনায় তিনি যে তাঁর এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছিলেন, তা নয়। তবে তিনি বলেছেন, 'আমরা–হিন্দুরা–ভূমিষ্ঠ হবামাত্র আমাদের নিজের জীবনের উপর স্বত্বস্বামিত্ব হারিয়ে বসি।' (হারীত, ১৯৯৭ : ১৮১) এ কথার ইঙ্গিত বোঝা কঠিন নয়। তিনি মনে করতেন, মনু-কৃত সমাজবিধান হিন্দু-মনের 'স্বত্বস্বামিত্ব' হারিয়ে ফেলবার সর্বপ্রধান কারণ। হিন্দু-মনের উপর এই বিধান বলবৎ থাকায়, 'আজ একশো বৎসর ইংরেজী শিক্ষা সত্ত্বেও সমাজ যেখানে ছিল প্রায় সেখানেই সে রয়েছে, তার কারণ যে-লোকের শক্তি নেই, তার যথার্থ মুক্তিও নেই।' (প্রমথ, ১৯৯০ : ৫৮) বাঙালির এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যে তিনি শক্তি অর্জনের পথই খুঁজছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লেখা অপর এক চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'আমাদের জাত concrete-এর জ্ঞান হারিয়ে বসে আছে—আমি চাই সেই জ্ঞানকে তোমরা আবার উদ্ধার করো। পৃথিবীতে concrete-এর চাইতে কি আর কিছু বেশি interesting জিনিষ আছে?' (প্রমথ, ১৯৯১ : ৫)

এই concrete-এর জ্ঞান কি? রবীন্দ্রনাথ যেটাকে 'ডাইনে-বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি' না-করার জ্ঞান বলেছেন, এ হচ্ছে তাই। এই জ্ঞানের, বিদ্যার, বুদ্ধির, রুচির, বৈদগ্ধ্যের নজির প্রমথ চৌধুরী বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

আমরা এই প্রমথ চৌধুরীকে বুঝতে চাইনি, স্বীকার করতে চাইনি তাঁর অনন্যতা। ফলে তাঁর সমাজদর্শন ও শিক্ষা-আদর্শ উপেক্ষিত থেকেছে। তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও বিচিত্র জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বিস্মৃতির শিকার হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর বলার বিষয়কে বাদ দিয়ে তাঁর বলার ভঙ্গিকে আমরা বড় করে তুলেছি। এর ফল সম্পর্কে অতুলচন্দ্র গুপ্ত (১২৯১-১৩৬৭) আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। *প্রবন্ধসংগ্রহ*-এর ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত বলতে ভোলেননি যে, প্রমথ চৌধুরীর বলার ভঙ্গি যদি তাঁর বিষয়ের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং তা যদি বিস্তার লাভ করে, তবে আমাদের পক্ষে সেটা হবে 'দুর্ভাগ্যের'।[৩] (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৩) অতুলচন্দ্র গুপ্তের আশঙ্কা আমরা ঠেকাতে পারিনি। কারণ প্রমথ চৌধুরীর রচনার যেটা গৌণ দিক, যা তিনি বিরুদ্ধ সমালোচকের চোখে ধাঁধা লাগাবার জন্যে তাঁর ওকালতি বুদ্ধির ম্যাজিক দেখিয়েছেন, যাতে আছে তাঁর সস্তা কথার মারপ্যাঁচ ও বিশেষ ভঙ্গির চমৎকারিত্ব, আমরা সাধারণ পাঠকেরা তারই মোহে অভিভূত হয়ে পড়েছি। অপরদিকে তাঁর গভীর চিন্তার বিষয়কে উপেক্ষা করেছি। তাঁর রচনার মৌল অভিপ্রায় যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভায় গড়ে তোলা চিন্তার প্রাচুর্য, সেটা আমাদের উল্লিখিত অগভীর ও স্থূল মনের কাছে ধরা পড়ে না। প্রমথ চৌধুরীর রচনার বিশেষত্ব সম্পর্কে 'বীরবল' প্রবন্ধে সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন,

> প্রমথবাবুর লেখায় যদি কিছুর প্রাচুর্য্য থাকে তবে সে হচ্ছে চিন্তার প্রাচুর্য্য—কাজের কথার প্রাচুর্য্য—সার কথার প্রাচুর্য্য। এ সার কথা বাইরের সার কথা নয়—ভিতরের; বাইরের ব্যবস্থা নয়—ভিতরের; ভিতরে যে অবস্থাটি ঠিক হলে বাইরের সকল ব্যবস্থাগুলি ঠিক হয়ে উঠবে তারই কথা—এক কথায় মানুষ হবার কথা। (সুরেশ, ১৩২৬ : ৩৯)

প্রমথ চৌধুরী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যে লেখার অন্তরে চিন্তার বালাই নেই, সে লেখাকে কি সুলিখিত বলা চলে? চিন্তা মনের একটি ধর্ম। এ ধর্ম-বঞ্চিত লেখাকে কি কখনও সুলেখা বলা যায়? কেবলমাত্র শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনাকে লেখা বলা চলে না।' (প্রমথ, ১৯৯০ : ৮৮) আমরা ধরে নিয়েছি, প্রমথ চৌধুরীর রচনা কেবল 'শব্দের সঙ্গে শব্দের যোজনা' নয়, তা 'বীরবল'-এর শানিত কথার 'ফুলঝুরি' মাত্র! অতুলচন্দ্র গুপ্তের বক্তব্য ছিল এই ধারণার চরম প্রতিবাদ। তিনি বলেছিলেন,

> বিষয়বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজ ঘরোয়া কথায়। যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্য ও তর্কাতীত, বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যা আধুনিক ও সাময়িক, অতিপ্রাচীনের মধ্যে তার ছবি আবিষ্কার ক'রে মানুষের মন চরিত্রের মূল ঐক্য দেখিয়েছেন। (...) ঋজু কঠিন তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা। সে কথা বলার প্রয়োজন চিরকাল থাকবে। এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১২-৩)

অতুলচন্দ্র গুপ্তের উল্লিখিত বক্তব্যের বিশ্লেষণ কোথায়? কোথাও নেই! আছে তাঁর হালকা মেজাজের নানা কথার বহুজনের করা অযথা ব্যাখ্যার দৌরাত্ম্য! বাঙালির মানসধর্মে আমূল পরিবর্তন ঘটানোই ছিল প্রমথ চৌধুরীর প্রধান উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা। কলম ধরেছিলেন তিনি বিত্তের লোভে নয়, যশ ও সম্মান লাভের আশায় নয়, প্রতিভার অলৌকিক প্রেরণা থেকে নয়, প্রাণের দায়ে।[৭] 'প্রাণের কথা' প্রবন্ধে তিনি বলেন যে,

> মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে-বাইরে যে গতিশক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভপরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া আয়ু বৃদ্ধির অপর কোনো অর্থ নেই। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪৯০)

এই হচ্ছে প্রমথ চৌধুরীর আত্মস্বরূপ। অর্থাৎ বাঁচার মতো বাঁচতে হলে 'জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে তোলা ছাড়া' তিনি আর কোনো বিকল্প কিছু খুঁজে পাননি। এই অদ্বিতীয় পথে জীবনের উন্নতির জন্যে 'মানুষের পক্ষে যেমন লাঙল চাই তেমনি লেখনীও চাই, যেমন হাতুড়ি চাই তেমনি তুলিও চাই; জাতীয় জীবনে যেমন পলিটিক্স ও ইকনমিক্স চাই তেমনি বিজ্ঞান ও আর্ট, কাব্য ও দর্শনও চাই।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪০৮) কোন্ অনুপ্রেরণা থেকে প্রমথ চৌধুরী এই আত্মজাগরণের সন্ধান লাভ করেন? কবি নরেশ গুহ (১৯২৩-২০০৯) প্রমথ চৌধুরীর *প্রবন্ধসংগ্রহ*-এর আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন,

> বেগবান ইউরোপের চিত্তলোক তাঁর কাছে অবারিত ছিল বলে তাঁর মন প্রাণ অধিকার করেছিল রেনেসাঁসের চিন্তাভাবনা, এক ফরাসি বিপ্লব ব্যতীত যার তুল্য সামাজিক অভ্যুদয়ের ঘটনা ইউরোপের ইতিহাসে দুবার ঘটেনি। (...) প্রমথ চৌধুরী ভেবেছিলেন যে স্বদেশী আন্দোলনের ঝড়ঝাপটার সুযোগে দেশের মনের পতিত জমিতে রেনেসাঁসের বীজ পুঁতবেন।' (নরেশ, ১৩৬১ : ২৯২)

এ কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ ১৯০৫ সালে লেখা প্রমথ চৌধুরীর 'তেল নুন লকড়ি' প্রবন্ধ। সমাজ-বিশ্লেষণের এক সুন্দর প্রবন্ধ এটি। বাঙালি ইউরোপের প্রভাবে কতদিকে নিজেদের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেছিল, এ প্রবন্ধ তারই ব্যাখ্যা।[৮] এ প্রবন্ধে অবশ্য একটা চরম শিক্ষার কথা ছিল। সে কথাটি এই :

> আমাদের স্বদেশের কীর্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চা করব বলে চিৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৪৬)

প্রমথ চৌধুরী এখানে যা বলতে চেয়েছেন, তার একটা অর্থ এই যে, বলা হয়েছিল, তখন ভারতবর্ষে বাঙালি জাতির স্থান ছিল সবার উপরে। তিনি দেখিয়েছেন, 'কি সাহিত্যে, কি আর্টে, কি বিজ্ঞানে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, বাঙালি যে আজ ভারতবর্ষে সর্বাগ্রগণ্য জাতি, বাঙালির চিন্তা, বাঙালির কর্ম আজ যে বাকি ভারতবর্ষের আদর্শ, বাঙালি যে এ যুগে মানসিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষের যুগপৎ শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু, তার কারণ (...) বাঙালির জীবন আজ একশো বৎসর ধরে অগ্রসর হয়েছে।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৬৬-৭) এমন কৃতিত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার যে জাতি বহন করছে, তার ভবিষ্যৎ আরো উন্নত ও বিকাশ লাভ করবে—এই আশা প্রমথ চৌধুরী মনে পোষণ করতেন। এই জাতীয় কৃতিত্বের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, বাঙালির মন ও তার প্রকৃতি, তার সমাজ ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ সেই উচ্চতায় উন্নীত হওয়া উচিত, একদিন যে উচ্চতায় উঠেছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা। তিনি ১৯১৮ সালে লেখা তাঁর 'বই পড়া' প্রবন্ধে বলেন,

> আমার মতে এ যুগের বাঙালির আদর্শ হওয়া উচিত প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা, কেননা এ উচ্চ আশা অথবা দুরাশা আমি গোপনে মনে পোষণ করি যে, প্রাচীন ইউরোপে এথেন্স যে স্থান অধিকার করেছিল, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে বাংলা সেই স্থান অধিকার করবে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে, তা ছিল একাধারে ডেমোক্রাটিক এবং অ্যারিস্টোক্রাটিক; অর্থাৎ সে সভ্যতা ছিল সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৫৩)

সেকালের ভাষায় বলা যেতে পারে 'বঙ্গসরস্বতীর সেবক ও সৈনিক' হওয়ার কাজে হাত দিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী, যেটা ছিল তাঁর ভাষায় 'সামাজিক জীবনে ডেমোক্রাটিক এবং মানসিক জীবনে অ্যারিস্টোক্রাটিক'-এর সাধনা।' *সবুজ পত্র* তাঁর এই 'উচ্চ আশা অথবা দুরাশা'পূর্ণ মনোভাব থেকে প্রকাশিত হয়। তাই এবার তার কথায় আসা যাক।

৫

সবুজ পত্র-এর জন্ম ও তার আদর্শ সম্পর্কে *আত্মকথায়* প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন,

> আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। (...) এই বোটেই মণিলালের কাছে শুনি যে, রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, আর লিখবেন না, তিনি ঢের লিখেছেন। (...) তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বার করে, তাহলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম—আপনি যদি লেখেন তা হলে আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিনি বললেন, অন্য কোনো কাগজে আমি লিখব না। মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজ পত্র নামে ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমি দিয়েছিলুম। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, ১৩২১ সালের বৈশাখে সবুজ পত্র প্রথম বেরোয়।
>
> এই কাগজ উপলক্ষ্য করে যে-সব যুবক কমলালয়ে আমার কাছে আসতেন, তার মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ও তাঁর ভগ্নিপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন। আর ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখুজ্জে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র চাটুজ্জে, অমিয় চক্রবর্তী, বরদাচরণ গুপ্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র ঘটক, মানিকচন্দ্র দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, সোমনাথ মৈত্র প্রভৃতি।
>
> (...) এই সবুজ-সভার সভ্যগণ হপ্তায় একদিন ক'রে আমার কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর কখনো সাহিত্যালোচনা, কখনো সংগীতচর্চা হত। শুনতে পাই যে, সত্যেন বোস এস্রাজ বাজাতেন, কিন্তু আমি তাঁর এস্রাজ কখনো শুনিনি। মন্টু (দিলীপ রায়) যখন আসত, সে গান করত। বাড়ির মেয়েরাও কখনো-কখনো করত।
>
> লেখবার মধ্যে আমিই নিয়মিত মাসে মাসে সবুজ পত্রে লিখতুম। আর রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন সে-কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না ক'রে সবুজ পত্রের কোনো সংখ্যাই বেরোয়নি। এবং তাঁর সাহচর্য না পেলে যে আমি ছয় মাসও সবুজ পত্র চালাতে পারতুম না, সে-কথা বলাই বাহুল্য। সবুজ পত্র আকারে চৌকোণা ও ছোটই ছিল, আট-ন' ফর্মার বেশি নয়। তার মলাটের রঙ বাস্তবিকই সবুজ ছিল, এবং তার উপরে একটি কালো তালপাতার নকশা থাকত। সেটি নন্দলালের হাতের আঁকা। কাগজ এবং ছাপা ভালোই ছিল। সবুজ পত্র ছবি এবং বিজ্ঞাপন-ছুট ছিল। (...) প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির রচনায় যাতে একটি নির্দিষ্ট আদর্শ রক্ষিত হয়, সম্পাদক হিসেবে আমি বরাবর সেই চেষ্টাই ক'রে এসেছি। এবং আজ পর্যন্ত সাহিত্য-সমাজে সবুজ পত্রের যে সুনাম আছে, সে ঐ কারণেই। (প্রমথ, ১৪১৪ : ৮৮-৯)

সবুজ পত্র প্রকাশের এই হচ্ছে ইতিহাস। এই ইতিহাসের মধ্যে পত্রিকার উদ্দেশ্য কী ছিল, প্রমথ চৌধুরী তাঁর *আত্মকথায়* সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। এমনকি 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' প্রবন্ধেও তিনি সরাসরি তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেননি। তবে উক্ত মুখপত্রে তিনি যা বলেছেন, তার থেকে তাঁর লক্ষ্য বোঝা কঠিন নয়। মানুষের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে সমাজের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলা। এটা আজো বিপুল অধিকাংশ মানুষের সম্পর্কে সত্য। বিশেষ শিক্ষার গুণেই কেবল সে বুঝতে পারে সমাজে মানিয়ে চলাটাই জীবনের সার্থকতা নয়। জীবনের আসল রূপ জীবন থেকেই আবিষ্কার করতে হয়। না পুঁথি থেকে তা পাওয়া যায়, না সমাজের বাহ্যিক আচরণ থেকে। মানুষের আসল রূপকে জাগিয়ে তোলায় এবং বিকশিত করতে যা সহায়ক, তারই নাম সাহিত্য। প্রমথ চৌধুরী মনে করেন,

> মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানি নে, কেননা জানি নে। সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪২)

'মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা'র কাজে যে-সাহিত্য সহায়ক নয়, সে শুধু 'বাক্-ছল' মাত্র। এটাকে তিনি বলেছেন, 'স্ত্রীপাঠ্য শিশুপাঠ্য স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য।' প্রতিদিনের একঘেয়ে শিক্ষার সঙ্গে এর যোগ থাকতে পারে কিন্তু মানবজীবনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ 'সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।' এই ব্যক্তিত্ব-বিকশিত সাহিত্য ছিল তাঁর লক্ষ্য। অপরদিকে, সমকালীন জগতে নানা জ্ঞানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে বাংলার যে-ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। এ কথার প্রমাণ, তিনি লিখেছিলেন, 'ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব জ্ঞান লাভ করেছি। সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আনো-না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ করতে হবে।' কেননা

> দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধে নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ করলেই তাতে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪৫-৬)

প্রমথ চৌধুরী আরো বলেছেন, 'ফুলের চাষ করতে হয়, জঙ্গল আপনি হয়।' এই ফুলের চাষ করবার অর্থ ছিল গভীর। সেই গভীরতা থেকেই *সবুজ পত্র*-এর উদ্ভব হয়েছিল। এই গেল এ পত্রিকা প্রকাশের একটি দিক। অপর একটি অলিখিত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসাও ছিল *সবুজ পত্র*-এর সামনে।

৬

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেপ্পান্ন বছর। ইতোমধ্যে তিনি অনেক সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, কিন্তু সাহিত্যের নতুন মোড় ফেরাতে কোথাও তার কোনো সার্থকভূমি তৈরি হয়নি। সেজন্যে তিনি প্রমথ চৌধুরীর *গল্পসংগ্রহ*-এর ভূমিকায় বলেন,

> আমি যখন সাময়িকপত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্রে 'সবুজ পত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলুম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটি বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন, তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্য কোনো পরিপ্রেক্ষণীর মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে সাহিত্যের এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনও কুণ্ঠিত হই নি। (রবীন্দ্র, ১৪১২ : ৯)

রবীন্দ্রনাথের নিজের অকৃতার্থতার দুঃখের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর কৃতিত্বের স্বীকারে আনন্দ প্রকাশ একটা অর্থপূর্ণ ইশারা দেয়। এই সময় তিনি নোবেল পুরস্কার (১৯১৩, ১৩ নভেম্বর)

পেলেন। সে প্রাপ্তি তাঁকে এনে দেয় দুনিয়াজোড়া কবিখ্যাতি ও সম্মান। স্বভাবতই সেটা তাঁর মনকে নতুন উৎসাহে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। সে সম্মানের উদ্দীপনা তাঁর স্বদেশবাসীর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। প্রমাণ, এ পুরস্কার প্রাপ্তির মাত্র ছয় মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পঁচিশে বৈশাখ *সবুজ পত্র*-এর প্রকাশ। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যথার্থই বলেছেন, 'সবুজ পত্র প্রকৃতপক্ষে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দনপত্র।' (হীরেন্দ্র, ১৩৭৫ : ৩৩৬) প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। পাশ্চাত্যের সঙ্গে নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতার ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে যে বিশ্বনাগরিতার বোধ জন্মেছিল, সেই বোধের নতুন প্রকাশ যাতে বাধাহীন হতে পারে এবং সেটা যেন তখনকার প্রতিষ্ঠিত সাময়িকপত্রিকার বিচিত্র বিষয়ের ভিড়ের মধ্যে একাকার হয়ে না-যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরী *সবুজ পত্র* প্রকাশ করে সেই সোনার ফসল তোলার জন্যে কোল পেতে দিলেন। তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা ছিল, 'সংকলনের দ্বারা ঝুলি ভর্ত্তি করা মন তাঁর নয়' (রবীন্দ্র, ১৩৭৯ : ১৪৫) —যেন এই শুভ মুহূর্তের জন্যে *সবুজ পত্র* হাতে নিয়ে প্রমথ চৌধুরী অপেক্ষা করছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন! হারীতকৃষ্ণ দেব এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'রবিবাবু নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর ওঁর এবং প্রমথবাবুর মনে একটা নব-উদ্যমের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল নিশ্চয়।' (হারীত, ১৯৯৭ : ১০৪) এ কথা মিথ্যে নয়। কেননা দেখা গেল, দুটো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটল। ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি ও চেতনার সংঘাতে রবীন্দ্রসাহিত্যে নবরূপায়ণ দেখা দিল। আর প্রমথ চৌধুরী তাঁর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই সময়, *সবুজ পত্র* প্রকাশের আগে, রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একটা বাহ্যিক পার্থক্য ছিল। সেটা এই যে, প্রথমজন কেবল স্বদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত; দ্বিতীয়জন বিশ্বে তো দূরের কথা, স্বদেশেই ছিলেন অপরিচিত। *সবুজ পত্র* প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রথমজনের মানসধর্মে এল নতুনত্বের তাগিদ আর দ্বিতীয়জনের মধ্যে ঘটল আত্মশক্তির উদ্‌বোধন। কাজেই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার বাঙালির সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য অঙ্গনে যে বিপুল আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করে, *সবুজ পত্র* ছিল তারই এক অভিজ্ঞানপত্র। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রমথ চৌধুরী বলেছেন,

> পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই। কেবলমাত্র শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রাখতে পারে না। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪৯)

ভাষার দুই রূপ। একটা কাজের, অন্যটা চিন্তার। দুই মহৎ প্রতিভার স্পর্শে *সবুজ পত্র* বাঙালির সংস্কৃতিকে চিন্তাও কর্মের ক্ষেত্রে উর্বর করে তোলায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। কেননা বিশ শতকের শুরু থেকে বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব এবং শিল্প ও সাহিত্যের অঙ্গনে এমন সব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হলো যে, সেগুলো যেন এক-একটা ঢেউয়ের মতো একটার উপর আর-একটা আছড়ে পড়ছিল। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব উদ্ভাবিত হলো। দেখা গেল, প্ল্যাঙ্ক (১৮৫৮-১৯৪৭) ও আইনস্টাইন (১৮৭০-১৯৫৫) পদার্থবিদ্যায়, মর্গান (১৮১৮-৮১) ও ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) নৃতত্ত্বে, ফ্রয়েড (১৮৫৬-

১৯৩৯) ও ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) মনস্তত্ত্বে, মার্কস (১৮১৮-১৯৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫) সমাজতত্ত্বে, এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) ও পাউন্ড (১৮৮৫-১৯৭২) কাব্যে, মাতিস (১৮৬৯-১৯৫৪) ও পিকাসো (১৮৮১-১৯৭৩) শিল্পে সমগ্র পৃথিবীর সামনে শিক্ষিত মানুষের চোখ ও মনের পর্দা খুলে দিলেন এবং দৃষ্টিভঙ্গির আদ্যোপান্ত পরিবর্তন ঘটালেন। আবু সয়ীদ আইয়ুব (১৯০৬-১৯৮২) এই পরিবর্তন ও বদলে যাওয়া ইতিহাস সম্পর্কে মন্তব্য করেন,

> মার্কসবাদকে বলা হয় বৈজ্ঞানিক সত্য। অন্তত বিজ্ঞানভিত্তিক সত্য তো বটেই, এবং নববিজ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল। নবযুগের এমন বিরাট সত্যধর্মকে মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর চিন্তা-ভাবনায় আট্‌কে রাখার মানে কি মধ্যযুগের প্রদোষান্ধকারে ফিরে যাওয়া নয়? ঐ তিন মহামানবের প্রতিভাদীপ্ত মার্কসবাদ মানবজাতির অগ্রগতির ইতিহাসে একটি বিরাট পদক্ষেপ, কিন্তু চূড়ান্ত পদক্ষেপ নয়। আধুনিক যুগের বিজ্ঞান তো কোথাও থেমে নেই। গ্যালিলিও থেকে নিউটন, নিউটন থেকে ম্যাকসওয়েল, ম্যাকসওয়েল থেকে প্লাঙ্ক, প্লাঙ্ক থেকে আইনস্টাইন, আইনস্টাইন থেকে বোর, বোর থেকে শ্রোয়েডিংগার, শ্রোয়েডিংগার থেকে হাইসেনবার্গ তো নিরন্তর অগ্রগতির ইতিহাস, যেমন বিস্ময়কর, তেমনি সুন্দর। (আইয়ুব, ১৯৯২ : ১৩)

রবীন্দ্রনাথ এই 'সুন্দর'কে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে তথা বাংলায়। কাব্যরসের অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও অনুরাগী[৯] হয়েও যথার্থ জ্ঞানের ক্ষুধায় তাঁর মন কাঙাল হয়েছিল। ১৯০২ সালে তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে (১৮৫৮-১৯৩৭) এক চিঠিতে লিখেছিলেন,

> বিদেশী আমাদিগকে জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া থাকে — তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায় — আমাদের দৃষ্টি পীড়িত হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি — আর কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে — তপস্যার পথ, সাধনার পথ আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই — আর একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আরোহণ করিতে হইবে — নহিলে মাথা তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। (চিঠিপত্র ৬, ১৯৯৩ : ৪৬)

রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে বড় করে তুলতে চেয়েছিলেন। চিন্তায়, কর্মে এবং মনে তিনি বাঙালির ঐশ্বর্য ও গভীরতা আশা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে একটা পরম্পরা সহজেই লক্ষণীয়। নোবেল পুরস্কার তাঁর মনের বিস্তার ও লক্ষ্যের আহ্বান বাড়িয়ে তুলেছিল। তিনি প্রমথ চৌধুরীকে লিখেছেন, 'সবুজ পত্রে মাঝে মাঝে কাজের কথার আলোচনা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি — বিশেষত যে সব কাজের মধ্যে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টার হাত আছে। (...) সবুজের প্রেমিক আমার আবেদন এই যে, কাজের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যেখানে নূতন চিন্তা ও নূতন চেষ্টা দেখা দিয়েচে সেইখানকার বার্ত্তা তোমার পত্র বহন করে প্রচার করুক।' (চিঠিপত্র ৫, ১৪০০ : ২২৫-৫,) এই তাড়া খেয়ে প্রমথ চৌধুরী হারীতকৃষ্ণ দেবকে (১৮৯৪-১৯৬৬) এক চিঠিতে লিখেছেন, 'রবিবাবু মহাশয় আমাকে ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছেন, ইউরোপীয় নতুন চিন্তাসব সবুজ পত্রে প্রকাশ করতে। আমার পক্ষে একহাতে তা করা অসম্ভব। সুতরাং আমি দু'চারটি এমন লোক চাই, যাদের হাতে ইংরাজি বই দিলে তা বাংলা প্রবন্ধে রূপান্তরিত হবে।' (হারীত, ১৯৯৭ : ১৫৩)

হারীতকৃষ্ণ দেবকে লেখা প্রমথ চৌধুরীর এই চিঠির একটা গুরুতর কারণ ছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বারবার তাগিদ দিয়েছিলেন নতুন লেখক জোগাড় করতে।[১০] প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের অনেক চিঠিতে এই তাগিদের কথা উল্লেখ আছে। ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, *আত্মকথায়* প্রমথ চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, তাঁর বাড়িতে, প্রতি সপ্তাহে সাহিত্যিকদের নিয়মিত আড্ডা বসত। *সবুজ পত্র*-এর লেখক বাড়াবার তাগিদ থেকে যে এ আড্ডা আয়োজিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এই আড্ডা সম্পর্কে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন,

> এই মজলিশটি ছিল সাহিত্যিক মনের রসায়ন। বাংলা সাহিত্য, বাংলা ভাষা, বাংলা গদ্যের রচনারীতি স্বভাবত এখানে প্রায়ই আলোচনা হ'ত। কিন্তু আলোচ্য বস্তুর তা ছিল অংশমাত্র। দেশ-বিদেশের প্রাচীন ও নবীন সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, দেশী বিদেশী রাষ্ট্রব্যাপার কিছুই বাদ যেত না। সব বিষয়ের অল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞ দু-একজন ক'রে মজলিশে ছিলেন। তবে সব আলোচনায় সকলেই যোগ দিতেন, এবং আলোচনার ধারা এমন ছিল অবিশেষজ্ঞের মন ও বুদ্ধি যাতে উৎসুক ও উন্মুখ হয়ে ওঠে। কোন্ বিষয়ে নতুন ভাল বই কি বেরিয়েছে সে খবর এখানে আদানপ্রদান হত, আর সে পুঁথি সংগ্রহ ক'রে পড়া ছিল অনেক মজলিশির অবশ্য কর্তব্য। বেশির ভাগ বইএর খবর প্রমথবাবুই দিতেন এবং তিনিই কিনতেন। তাঁর বই মজলিশিদের হাতে হাতে ফিরত। বাঙালি লেখকদের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকদের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ—এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি। আর তার আয়োজন ও উপকরণের যোগান এখানে চলত। আলোচনার লক্ষ্য ছিল, এ সব বস্তু যাতে মনকে পুষ্টি ও স্ফূর্তি দেয়, তার বোঝা না হয়ে ওঠে। বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না। বুদ্ধিতে যা বাধে তাকে অগ্রাহ্য করতে হবে, তার সমর্থনে যত বড় নামই থাক না কেন। 'বাধিতমর্থং বেদোহপি ন বোধয়তি'—তা সে বেদ সংস্কৃতেই লেখা হোক, কি ইংরেজি ফরাসি জর্মান ভাষাতেই লেখা হোক। বলা বাহুল্য বহু বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করা, ও যাচাই না করে তাকে স্বীকার না করা, এ দুটি ছিল প্রমথবাবুর মনের প্রতিচ্ছবি। মজলিশিদের অল্পবিস্তর সমধর্মী মনে তার আকর্ষণ ছিল প্রবল। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি একদিন দেশের প্রাচীন ভাবধারাকে যাচাই করেছিল পাশ্চাত্য ভাবের আলোতে। সবুজপত্রের যুগে প্রয়োজন হয়েছিল এই নূতন ভাব ও সাহিত্যকে প্রাচীন ভারতবর্ষের ভাব ও সাহিত্যের আলোতে পরীক্ষা করতে। প্রাচীন ভারতবর্ষের যে সভ্যতা সচল ও সৃষ্টিকুশল ছিল তার সঙ্গে প্রমথবাবুর মনের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। তাঁর নিজের মন এই ঘনিষ্ঠতার দিকে আমাদের অনেকের মনকে অনুকূল করেছিল। (অতুল, ১৩৫৪ : ২৩৪-৫)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে একটা প্রধান কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চাই। আপ্তবাক্যের ও দানবিক শক্তির পরিবর্তে মানবিক শক্তির প্রতিষ্ঠা দরকার। উনিশ শতকে বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিতে এই শক্তির উদ্বোধন ঘটল। পুরাতন ভাব একেবারে মুছে গেল না, কিন্তু চিন্তায় একটা মৌল পরিবর্তন ধ্বনিত হলো। সেই প্রথম, সে-যুগে বৈজ্ঞানিক বিচারশক্তির প্রভাবে সংস্কারমুক্ত জ্ঞানের উপাদানগুলো শুদ্ধ বুদ্ধির আলোয় পরিশুদ্ধ হয়ে এল। বুদ্ধির মুক্তি ছিল তার লক্ষ্য। শুভবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ছিল তার কাম্য। চিন্তাশীলতায় আর শুদ্ধ যুক্তিতে ঘটে মনের মুক্তি। অযুক্তি, কুযুক্তি নয়, শুদ্ধ বুদ্ধি এবং বিবেকী বিচারের সাধনা ছিল সেই মুক্তির অঙ্গীভূত অভিপ্রায়। *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার* কালে, অক্ষয়কুমার দত্তের

প্রবর্তনায় জ্ঞানের গভীর ব্যাপকতার সঙ্গে বিচারশক্তির স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-সাধনার এই সময়কে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছিলেন নতুন যুগের পাদপীঠ বলে। *সবুজ পত্র* এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে 'বিনা বিচারে কোনও কিছু মানা হবে না।' এই ঘোষণায় বিশেষত্ব ছিল। কেননা সেখানে প্রত্যেক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিজে ছিলেন বাঙালির অন্যতম দার্শনিক। মানববিদ্যার প্রায় সকলক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রমথ চৌধুরীর সমতুল্য। তিনি ছিলেন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম ভাবুক ও রসজ্ঞ। পেশায় ওকালতি করলেও জীবন-যাপনে স্বাতন্ত্র্য এবং সাহিত্য ও সমাজ ভাবনায় তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য।[১১] *সবুজ পত্র*-এর প্রায় জন্মলগ্নে তাঁকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ এক রকম উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। অতুলচন্দ্র গুপ্তকে একজন 'ওস্তাদ লেখক' বলে অভিহিত করেছিলেন তিনি। (দেশ, ১৩৭৯ : ১৪৫)

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছাড়াও *সবুজ পত্র*-এর লেখকদের মধ্যে ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৮৭৩-১৯৬০) ছিলেন বিদুষী নারী। বহু ভাষাবিদ, অনুবাদক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং পিয়ানিস্ট।[১২] সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বিশেষজ্ঞতার বাঁধাপথে চলেননি। তাঁর মন ছিল মুক্ত। *সবুজ পত্র*-এ গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা সবই লিখেছেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর এতই গুণমুগ্ধ ছিলেন যে, তাঁকে পত্রিকার সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। হারীতকৃষ্ণ দেব ছিলেন নৃতত্ত্বের দিকপাল পণ্ডিত এবং ইতিহাসবিদ। প্রাচীন ভারত বিষয়ে তাঁর গবেষণা দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। ইতিহাস, রাষ্ট্রতত্ত্ব, সংগীত এবং সাহিত্যচর্চা ছিল তাঁর ক্ষেত্র। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যকে তিনি অনেকটা সমৃদ্ধ করেছেন। ভাষাবিজ্ঞানে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষজ্ঞতা বিশ্ববিখ্যাত। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও তার বিকাশের ইতিহাস রচনা তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কাজ হলেও তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকার। সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। নিজেকে তিনি আইনস্টাইনের শিষ্য বলে মনে করতেন। (সত্যেন্দ্র, ১৪০৫ : ১৯৩) এঁরা সকলেই সবুজপত্রগোষ্ঠী ও *সবুজ পত্র*-এর লেখক ছিলেন। অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন কিছু ব্যতিক্রম। তিনি সবুজপত্রগোষ্ঠীর হয়েও *সবুজ পত্র*-এ লেখেননি। তবে অতুলচনন্দ্র গুপ্ত যে বলেছেন, 'বাঙালি লেখকদের মনের পুঁজি যে পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দেশগুলির লেখকদের মনের পুঁজির চেয়ে কম হবে না, বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি লেখকদের মনের যোগ হবে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ—এটা ছিল মজলিশের অকথিত স্বীকৃতি।'—এই স্বীকৃতির মূল্য বৃদ্ধিতে সতেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক এই ভূমিকার কথা এবার সংক্ষেপে বলা যাক।

৭

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন হারীতকৃষ্ণ দেব। হারীতকৃষ্ণ দেব বলেন যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে পরিচয়ের আগে প্রমথ চৌধুরীর বিজ্ঞানের জ্ঞান ছিল 'কাঁচা'। সেজন্যে তিনি *সবুজ পত্র*-এ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লেখক হিসেবে পাওয়ার

জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। (হারীত, ১৯৯৭ : ২৪) এই চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীর যে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তাতে *সবুজ পত্র*-এর একটা প্রধান উদ্দেশ্যের কথা জানা যায়। একদিন বিকেলের আড্ডায় আহ্বান করে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে এক চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন,

> বাঙ্গলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটে আজ পর্যন্ত ফাঁকা রয়ে গিয়েছে। আর যতদিন বাঙ্গলা সাহিত্য জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে, ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যও আমাদের দু-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না, যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়—তা নিয়ে গৌরব করা তো দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য, প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ-ভূভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, একথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মতো প্রতিভাহীন লোকদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি তার ভাগ দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণে আমি আপনাকে 'সবুজপত্রে'র আসরে নামাতে চাই। (হারীত, ১৯৯৭ : ২৩-৪)

ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু *সবুজ পত্র*-এর দলে নাম লিখিয়ে ছিলেন কিন্তু ও-পত্রিকায় লেখেননি। এ নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর মনে কিছুটা দুঃখ ও অভিমান ছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'সত্যেন্দ্র সাদা কাগজের উপর কালো আঁচড় কাটেন না, বোধহয় তার কারণ তিনি কালো বোর্ডের উপর খড়ির সাদা আঁচড় কাটাটাই তাঁর স্বধর্ম বলে স্থির করে নিয়েছেন।' (হারীত, ১৯৯৭ : ২১৬) সত্যেন্দ্রনাথ বসু *সবুজ পত্র*-এ না-লিখলেও *সবুজ পত্র*-এর দলে যোগ দেবার ফল ভালো হয়েছিল।[১৩] কারণ তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রমথ চৌধুরীর মনে বিপুল উৎসাহ দেখা দেয়। বিজ্ঞানের প্রতিও তাঁর আগ্রহ বেড়ে যায়। এই আগ্রহের পরিণতি যা দাঁড়িয়েছিল, প্রমথ চৌধুরীর এক চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সবুজপত্রগোষ্ঠীর জনৈক সভ্যকে লিখেছেন,

> আমি ইতিমধ্যে খুঁজে দেখেছি, কিন্তু এক ভলুমে ফিজিক্স-এর বই কোন পপুলার সিরিজে পাইনি। তবে ও-বিষয়ের প্রতি ভাগের উপর খুব ভাল ভাল ছোট বই আছে।—আমি তার দু'একখানা আনিয়েছি। আমার বিশ্বাস আমাদের ফিজিক্সটে ভাগ ভাগ করে নিতে হবে। তুমি যদি ইলেকট্রিসিটির ভাগ নেও ত তোমাকে এ-বিষয়ে পপুলার বই দিতে পারি। তার থেকে তুমি অনেক সাহায্য পাবে, অন্তত কি রাখতে হবে, কি ছাড়তে হবে—তার হিসেব পাবে।' (হারীত, ১৯৯৭ : ১৪৯-১৫০)

সত্য যে, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, সেই পর্বে লেখা এবং *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর তিনটি প্রবন্ধ—'সুরের কথা', 'রূপের কথা', 'প্রাণের কথা' পড়লে দেখা যায়, সেখানে তিনি কলা এবং বিজ্ঞানের বিষয়ে যে গভীর জ্ঞানের স্বাক্ষর রেখেছেন, তাতে আছে বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত। অন্য তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য। আধুনিক পদার্থবিদ্যা কতদূর এগিয়েছিল—বাংলা ভাষায় তার পরিচয় দিয়ে, বীরবল, দিলীপকুমার রায় (১৮৯৭-১৯৮০) এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের যুক্তনামে প্রকাশ হয়েছিল *ধর্ম ও বিজ্ঞান* (১৯৩১)। বইয়ের সব রচনাই লেখা হয়েছিল চিঠিপত্রের আঙ্গিকে। বইটির মুখপত্রে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন,

> আজ বছর খানেক ধরে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, বীরবল ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নানা মাসিকপত্রে যে সব খোলা চিঠি লিখেছেন, সেগুলি একত্র করে প্রকাশ করছি। (...) উদ্দেশ্য হচ্ছে, নব ফিজিক্স যে পুরোনো বিজ্ঞানের ভিত টলিয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

প্রধানত বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০), হোয়াইটহেড (১৮৫১-১৯৪৭), এডিংটন (১৮৮২-১৯৪৪), জিনস (১৮৭৭-১৯৪৬) প্রমুখ ইউরোপীয় চার-পাঁচজন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর তৎকালীন নতুন মতবাদের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো রচিত হয়।

সবুজ পত্র আরেক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল। তা হচ্ছে চিন্তাজগতে যে-সমস্ত বই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ, বাংলা ভাষায় সে-সবের তরজমার করবার উদ্যোগ। এ লক্ষ্যে তাঁরা শুরুতেই রাজনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্বের তিনটি মহাগ্রন্থ—অ্যারিস্টোটলের *পলিটিক্স*, ম্যাকিয়াভেলির *দ্য প্রিন্স* এবং রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* — তরজমা করতে চেয়েছিলেন। ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন, কার হাতে দিলে ইংরেজি বই বাংলা হয়ে বেরোবে—এ কথার অর্থ এই যে, তিনি শুধু ইংরেজি বই নয়, তখন পর্যন্ত প্রকাশিত ফরাসি, জার্মান ও ইতালিয়ান ভাষার নানা মৌল জ্ঞানের ও বিচিত্র বিষয়ে লেখা বইয়ের বাংলা তরজমা করতে চেয়েছিলেন। এই কাজে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এমন লেখক, যিনি মাতৃভাষা ছাড়া আরো দু-একটি উন্নত ভাষা জানেন এবং মাতৃভাষার উন্নতি ও বিকাশে নিবেদিতপ্রাণ। পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোগ হিসেবে রুশোর *সোশ্যাল কন্ট্রাট*-এর তরজমার ভার দেওয়া হয়েছিল বহুভাষাবিদ ও নৃতত্ত্ববিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ননীমাধব চৌধুরীকে (১৮৯৮-১৯৭৪)। তরজমা হয়ে যাওয়ার অনেক পরে, ১৯৬৯ সালে এ বই অনুবাদকের নিজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়।[১৬] ননীমাধব চৌধুরী 'অনুবাদকের নিবেদন'-এ লিখেছেন,

> সাহিত্যাচার্য প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাসভবনে তখন বাংলার সুপরিচিত সবুজপত্র-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠক বসিত। বৈঠকে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে একদিন কথা উঠিল দেশে পলিটিক্যাল দর্শন ও বিজ্ঞানের বইয়ের অভাব সম্বন্ধে। এই আলোচনা পরবর্তী কয়েকটি বৈঠকেও চলিল এবং স্থির হইল তিনখানি বিখ্যাত গ্রন্থের, আরিস্ততলের *Politike* মাকিয়াভেল্লির *Del Principe* এবং রুশোর *Contract Social* মূল ভাষা হইতে বাংলা অনুবাদ করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বর্তমান অনুবাদককে অনুরোধ করিলে রুশোর গ্রন্থ ফরাসী হইতে বাংলায় অনুবাদ করিবার জন্য। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও অনুরোধ জানাইলেন। রুশোর গ্রন্থের অনুবাদ শেষ হইল দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে। অনুবাদককেই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইল কয়েক বৎসর পরে। প্রথম সংস্করণ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর শ্রীচরণে। (ননী, ১৯৯৫ : ৭)

ননীমাধব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, প্রমথ চৌধুরী ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রন্থের তরজমায় সহায়তা করেছিলেন—ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এবং রাষ্ট্রতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ফরাসি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রচনায়।

আসলে, প্রমথ চৌধুরী নিজে ছিলেন রেনেসাঁসপন্থী। ইতালির রেনেসাঁস তাঁর মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে তুলেছিল। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'আজকাল Machiavelli

পড়ছি, Prince নয় Discourse চমৎকার লাগছে। ও ভদ্রলোকের বুদ্ধির তারিফ না করে থাকা যায় না—সে বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি কঠিন। এ যুগে মানুষে মনোরাজ্যে তলওয়ার ধরতে জানে না—Renaissance-এর ইতালীতে তারা জানত। আর Machiavelli ছিলেন সে দলের ভিতর সব চাইতে বড় ওস্তাদ। এর সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে। দেখি কতদূর কি হয়।' (প্রমথ, ১৯৯১ : ১২) *সবুজ পত্র* প্রকাশের সময় তিনি রেনেসাঁসের ইতিহাস অনুপুঙ্খ পড়েছিলেন এবং স্বদেশের মাটিতে তিনি সেই রেনেসাঁসের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। *সবুজ পত্র* ছিল এই রেনেসাঁসের মুখপত্র। ভাষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর রেনেসাঁসীয় অভিপ্রায় *সবুজ পত্র*-এর প্রতি পাতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'তাই-না বাঙালি যুবক আইনস্টাইনের নবাবিষ্কৃত আলোকতত্ত্বের পরিচয় নিতে এত ব্যাকুল। (...) আমাদের জাতীয় মন জ্ঞানমার্গের পথিক বলেই বাংলায় জগদীশ বসু, প্রফুল্ল রায়ের আবির্ভাব হয়েছে। মনোজগতে বস্তুর প্রতি আমাদের এই আন্তরিক অনুরাগ আছে বলেই বিজ্ঞানের মন্ত্রভাগ আয়ত্ত করবার দিকে বাঙালির এতটা ঝোঁক।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪১০) প্রমথ চৌধুরীর এই অভিমত ব্যক্ত হয় 'বাঙালি-পেট্রিয়টিজম' প্রবন্ধে। এটি প্রকাশিত হয় ১৩২৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের *সবুজ পত্র*-এ। বাংলায় বিজ্ঞানের সাধনা বাঙালি বিজ্ঞানীদের মনে কী গভীর প্রেরণা লাভ করেছিল, উল্লিখিত তথ্য তার প্রমাণ। বাঙালি যে-যুবকদের কথা এখানে বলা হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩-১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩-১৯৭২)। আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে আইনস্টাইনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৫ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধে ১৯১৮ সালে জার্মানি পরাজিত হবার পরে বিশ্ব-পরিস্থিতি আগের মতো শান্ত হয়ে আসে। তখন বিশ্বের বিজ্ঞানীদের মধ্যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব আলোচিত ও আলোড়িত হয় এবং তাঁর খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় উল্লিখিত তিনজন বাঙালি যুবক সদ্য শিক্ষকতা করছেন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞানের ক্লাস খুলে দিয়েছে। বিপুল উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা আইনস্টাইনের নতুন তত্ত্বের সব প্রবন্ধ মূল জার্মান থেকে ইংরেজিতে তরজমা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, সে তরজমা গ্রন্থরূপ নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয় (সত্যেন্দ্র, ১৪০৫ : ১৯২)। বাঙালি যুবকদের মধ্যে এই উৎসাহ ও উদ্দীপনার কারণ কি? 'উত্তরবঙ্গ রায়ত কনফারেন্সের রঙ্গপুর অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে' প্রমথ চৌধুরী বলেন যে, 'এ যুগে সব চাইতে বড় বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, এবং জ্ঞান বিজ্ঞানই হচ্ছে বুদ্ধির প্রধান খোরাক। আমাদের মনকে সে খোরাক না যোগালে জাতির যে সর্ব্বপ্রধান শক্তি তাই ক্ষুণ্ন হয়ে পড়বে, তার চাইতে সর্ব্বনাশের বিষয় আর কিছু হতে পারে না।' (প্রমথ, ১৩২৭ : ৩১৯) বাংলা ভাষাকে এই 'সর্ব্বনাশের' হাত থেকে রক্ষা করতে না-পারলে বাঙালির ভবিষ্যৎ নেই — এই ছিল ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধের মূল কথা।

৮

প্রমথ চৌধুরী ভাষার গতিপ্রকৃতি ও তার অন্তরের সংবাদ জানতেন। 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে ভাষার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী ও *সবুজ পত্র*-এর একটা প্রধান কথা ছিল এই : 'ভাষার

উৎপত্তি কর্মে, আর তার পরিণতি জ্ঞানে। (...) জ্ঞান ও চিন্তার বাহন হয়েই ভাষা তার স্বরূপ ও স্বরাজ্য লাভ করে।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৩৪-৫) এর থেকে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, *সবুজ পত্র* চিন্ত ও মননের চর্চায় ভাষাকে কোন স্তরে উন্নীত করতে আগ্রহী ছিল। ভাষাকে অবলম্বন করেই রচিত হয় সাহিত্য। সাহিত্য ভাষা-বিকাশের এক প্রধান মাধ্যম। কিন্তু কেবল সাহিত্যনির্ভরতা দিয়ে কোনো ভাষার উন্নতি ও বিকাশ সম্ভব নয়। কেননা ভাষা হচ্ছে জ্ঞানের আধার (depository of knowledge)। একটি ভাষায় বহুবিধ জ্ঞানের চর্চা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্তার অনুশীলন ছাড়া ভাষা জীবন্ত রূপ লাভ করে না। কোনো-একটা উন্নত ভাষার সমৃদ্ধির মূলে দেখা যায় সে ভাষা সমৃদ্ধ সাহিত্য আর নানা জ্ঞানের সমাবেশ ও চর্চায়। জ্ঞানের চর্চা বলতে বোঝায় দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্ম, সংস্কৃতি, ভূগোল, মনস্তত্ত্ব — অর্থাৎ মানবজ্ঞানের এমন বহু বিদ্যার চর্চা, যাতে থাকে শিক্ষিত মনের সম্মিলিত প্রয়াস। জাতীয় কর্মপ্রচেষ্টায় মানুষের বিরাট আকাঙ্ক্ষা আর জীবন সম্পর্কে উন্নত ধারণা ও চিন্তাভাবনা থেকেই কেবল এসব বিদ্যা চর্চার আশা করা যেতে পারে।

বাংলা ভাষার দেশে দেখা যায়, গত দুশো বছরের মধ্যে ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান এবং দেশীয় বিভিন্ন ভাষার সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে থেকেও একমাত্র সাহিত্যের উন্নতি ছাড়া জ্ঞানের অন্য ক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি চোখে পড়ে না। বাংলা ভাষাকে যেন আজ একটিমাত্র ক্ষেত্রে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। 'বাংলার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে বলা হয়েছিল,

> বঙ্গ সাহিত্য যতদিন কেবলমাত্র গল্প ও গানের গণ্ডির ভিতর আটকা থাকবে, ততদিন শিক্ষিতসমাজে বঙ্গ ভাষা যথার্থ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে না। কেননা শ্রেষ্ঠ কাব্য সাহিত্যের মুকুটমণি হলেও সস্তা কথা ও গাথা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। নিকৃষ্ট কাব্যসাহিত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াতে কোনো সাহিত্যেরই গৌরব বৃদ্ধি হয় না, এবং অক্ষম হস্তের অযত্নপ্রসূত গান ও গল্প প্রায়ই উৎকৃষ্ট হয় না। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৩৪)

প্রমথ চৌধুরী সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁর কালে বাংলা 'সাহিত্যে রসমাহাত্ম্যকীর্তন ও রসতত্ত্ববিচারের বেজায় ধুম পড়ে' গিয়েছিল। নিঃসংকোচে বলা যায়, আজ প্রায় একশো বছর পরেও বাংলাদেশের সাহিত্য এই 'কীর্তনে' অক্লান্ত।

বাংলা ভাষার অপরিণত যুগে বাংলা প্রথমে সংস্কৃত, পরে ইংরেজির আক্রমণের মুখে পড়ে। ভাষাকে সেই শোচনীয় দশা থেকে রক্ষা করেন রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ বাঙালির শ্রেষ্ঠ মনীষা। এঁদের মহৎ প্রতিভায় আর সযত্ন-প্রয়াসে গড়ে তোলা এই ভাষা বহুবার নানা রকম সংকটের মুখে পড়ে। কখনও তা রাজনৈতিক, রাষ্ট্রিক, কখনো অর্থনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক। জ্ঞানের চর্চা বহু বিচিত্রমুখী না হওয়ার ফলে এ ভাষায় গ্রন্থকার ও বড় লেখকের আবির্ভাব কমে যাচ্ছে। বাংলা ভাষায় অবশ্য আজ অসংখ্য লেখকের জন্ম হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে গ্রন্থকারের সংখ্যা কম। গ্রন্থকার ও বড় লেখক হ্রাস পাওয়ার ফল কী হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী 'বঙ্গ সাহিত্যের নবযুগ' প্রবন্ধে একরকম ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন,

> প্রাচীন সাহিত্যের কীর্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্তিগুলি আকারে ছোটো হয়ে আসবে কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে, আকাশ আক্রমণ না করে মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মতো উঁচুর দিকে ঠেলে উঠবে না, ঘাসের মতো চারি দিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায়, বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে গিয়ে স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে অন্তত ষষ্টিসহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৪-৫)

এই অন্ধকার ঘনিয়ে আসার কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন,

> আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে, নচেৎ মাসিকপত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে লিখতে না হলেও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা মাসিক পত্রের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো। কি যে বেরল তাতে বেশি কিছু আসে-যায় না। তা ছাড়া আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতোসেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সকল ব্যাপারেই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৫)

বাংলা ভাষা এবং এ ভাষার লেখকদের আজ যে অবস্থা লক্ষ করা যায়, প্রমথ চৌধুরীর উক্ত কথা এ ক্ষেত্রে যেমন উপযুক্ত তেমনি প্রাসঙ্গিক। কেননা প্রমথ চৌধুরী যাঁকে 'গ্রন্থকার' বলেছেন, নির্দ্বিধায় বলা চলে বাংলা ভাষায় আজ তেমন গ্রন্থকারের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে আমরা সকলেই 'নীতির জুতোসেলাই থেকে ধর্মের চণ্ডীপাঠ' নিয়ে ব্যস্ত।

কিন্তু এখানে এক নতুন জিজ্ঞাসা তৈরি হলো। 'গ্রন্থকার' তাহলে কাকে বলব। দু-কথায় অবশ্য তার উত্তর দেওয়া সম্ভব। তবে তার আগে বলে নেওয়া দরকার গ্রন্থ কী। এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর সহজ হতে পারে।

বাংলা ভাষার প্রধান অভিধানগুলিতে গ্রন্থ শব্দের যে-সমস্ত অর্থ দেওয়া হয়েছে সে-সবের মধ্যে একটি হচ্ছে 'সন্দর্ভ'। এ শব্দের মানে যেখানে থাকে বড়ো বিষয়ের বিস্তার ও সমাবেশ। বিষয়ের গূঢ়ার্থ, রহস্য ও তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। ধর্মগ্রন্থ, শাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি উক্ত অর্থ থেকে প্রতিপাদিত হয়েছে। এ সংজ্ঞা অনুসারে গ্রন্থকার বলতেও বোঝানো হয়েছে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়নকারী, ধর্মের ব্যাখ্যাতা। জীবনে, সমাজে মেনে চলতে হবে এমন বিধানের সূত্রবদ্ধ প্রকাশ যাঁর দ্বারা প্রণীত, তিনি গ্রন্থকার বা গ্রন্থপ্রণেতা। অনেক সময়, গ্রন্থকার না-বলে 'ভাষ্যকার' বলেও অভিহিত করা হতো এঁদের।

গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের এই ব্যাখ্যা অবশ্য আজ আর যথেষ্ট নয়। কেননা আধুনিক জীবনে মানুষের জীবনের সীমানা ও জ্ঞানের পরিধি কোথাও আটকে নেই। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, সমাজতত্ত্বে, নৃতত্ত্বে, ইতিহাসে, লোকঐতিহ্যে, ধর্মতত্ত্বে — জ্ঞানের গভীর-সূক্ষ্ম বিষয় থেকে, বহু-বিচিত্র ক্ষেত্রে, নতুন নতুন প্রান্তরে তা প্রসারিত হয়েছে। এসব বিষয় নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে মানুষ গ্রন্থ লিখেছেন। একখণ্ড থেকে একাধিক খণ্ডে। তাতে কোনো একটা বিষয়ের আগাপাশতলা—তার সমস্ত খুঁটিনাটি,

নাড়িনক্ষত্র অনুপুঙ্খ খুঁটিয়ে দেখেছেন—তলিয়ে দেখেছেন তার রহস্য—বুঝতে চেয়েছেন তার স্বরূপ। এমনিভাবে রচিত হয়েছে গ্রন্থ।

আরো কিছু খোলাসা করে বলা যাক কথাটা। গ্রন্থ হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তার ক্রমবিকাশমান রচনা—যাতে আলোচ্য বিষয়ের কোনো দিক বাদ না পড়ে এবং যাতে চিন্তার পারম্পর্য, যুক্তির ধারাবাহিকতা একটা সুসম্বন্ধ রূপের মধ্য দিয়ে এগিয়ে পরিকল্পিত সমগ্র ভাবটির পরিসমাপ্তি ঘটে। এ রকম পরিকল্পিত গ্রন্থের এক-একটা বিষয়ে, এক-একটা খণ্ড রচিত হয় শত শত পৃষ্ঠায়, হাজার হাজার পাতায়। কোনো-একটা দুরূহ বিষয়কে, সূক্ষ্ম-জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যাকে, অজানা থেকে জানার জন্যে, অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার জন্যে, অপরিষ্কৃত অবস্থা থেকে পরিষ্কৃত করার উদ্দেশ্যে, এসব গ্রন্থ রচিত হয়। আজ আমাদের সামনে গ্রন্থের এই বড়ো রূপ বিশেষ চোখে পড়ে না। আমরা গ্রন্থের এই মৌল রূপটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছি। এর একটা প্রধান কারণ, আজ আমাদের সামনে অসংখ্য লেখক আছেন—যাঁরা ফিচার লেখেন, কলাম লেখেন, নিবন্ধ-প্রবন্ধ লেখেন, গল্প লেখেন, রম্যরচনা লেখেন—একটা সময় আসে, যখন এগুলি জড়ো করে একটা বইয়ের আকার দিয়ে প্রকাশ করেন। সাধারণ পাঠকের সামনে এগুলি গ্রন্থ—আর এসবের রচয়িতা হচ্ছেন লেখক। কিন্তু উল্লিখিত বড়ো, দুরূহ, সমস্যাদীর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত কোনো গ্রন্থ পাঠকের সামনে নেই।[১৭]

যে-ভাষার গ্রন্থে এই ক্লাসিক্যাল অর্থ বিদ্যমান, সে-ভাষা গতিশীল ও জীবন্ত। এই ভাষা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'জীবন্ত ভাষা মাত্রেই পাঁচমিশেলী ভাষা, সে-ভাষার অন্তরে নানা বিদেশী শব্দ থাকে, আর তার ফলেই এ সমৃদ্ধি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ইংরেজী ভাষা।' (প্রমথ, ১৯৯০ : ৮৯) এই দৃষ্টান্ত থেকে *সবুজ পত্র* তথা প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে যে অনেকটা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তার কারণ তিনি মনে করতেন,

> ভাষা শুধু ভাবের ভাষা নয়, জ্ঞানেরও ভাষা। এমনকী হৃদয়ের ভাষা যে জ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করে, তা পাঠক মাত্রেই জানেন। জ্ঞানকাণ্ডহীন হৃদয়ের ভাষা 'হা হুতাশ' মাত্র।
> এখন আমাদের ভাষা যে নানা রূপ জ্ঞানপ্রকাশের ভাষা হয়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ এ ভাষা আজও আমাদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা নয়।
> মানুষে যাকে মনোভাব বলে, তা বহুল পরিমাণে মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। (প্রমথ, ২০০৮ : ৪২)

প্রমথ চৌধুরীর মতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক না-হলে ভাষা সাবালক হয় না। ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলো যে ভাষায় রচিত, তার প্রত্যেকটি ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার হয়েছে বলেই সেসব ভাষার সাহিত্যিকদের সচেষ্ট হতে হয়েছে সাহিত্যকে একটা উন্নত স্তরে তুলতে। তাঁর এসব মতামত থেকে বোঝা যায়, বাংলা, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। কথায় ও কাজে তিনি তার প্রমাণ রেখে গেছেন। অম্লান দত্ত (১৯২৪-২০১০) বলেন, 'সব ভালোবাসারই দুঃখ আছে; ভাষাকে ভালোবাসার দুঃখ কম নয়, ভাষাকে যে ভালোবাসে না, এ দুঃখ সে বুঝবে না।' (অম্লান, ১৩৮৮ : ১৪৩) কথাটি অন্যভাবেও বলা যেতে পারে। নিজের জীবনকে যে ভালোবাসতে শেখেনি, সমাজের আর-

পাঁচজন মানুষের প্রতি দায়-দায়িত্ব যে কোনোদিন স্বীকার করেনি, উপলব্ধি করেনি যে নিজের সমাজ, রাষ্ট্র ও ভাষার মর্যাদা, তাঁর পক্ষে এই ভালোবাসার দুঃখ বোঝা সম্ভব নয়। বাংলা ভাষার প্রতি প্রমথ চৌধুরীর ভালোবাসা নতুন কথা নয়। সেটা নয় বলেই তিনি এ ভাষাকে তার প্রগতির এক মহাসড়ক ধরে হাঁটাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৯

এ সত্ত্বেও তাঁর ভাষার কৃত্রিমতা দেখানো কঠিন নয়। সেটা ইতোমধ্যে অনেকেই দেখিয়েছেন — কেউ নিন্দা করে, কেউ প্রশংসা করে। এবং সে নিন্দা-প্রশংসার সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয়। তবে এ ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরী নিজে তাঁর ভাষার কৃত্রিমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। (অন্নদা, ১৯৯৯ : ৬৮) বুদ্ধদেব বসুর মতো অন্নদাশঙ্কার রায়ও (১৯০৪-২০০০) মনে করতেন, রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরী বাংলা ভাষার সর্বোত্তম লেখক। (অন্নদা, ১৯৯৯ : ৮০) এ সত্য স্বীকার করেও বলা যায়, দর্শন-বিজ্ঞান তথা জ্ঞানের তত্ত্বগত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা থেকে সহায়তা না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। প্রমথ চৌধুরী এ ধারায় কিছু সহায়তা করতে পারেন। কেননা ভাষার যৌক্তিক আচরণে ও শৃঙ্খলায় তিনি রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বুদ্ধিপ্রধান। *সবুজ পত্রকে* তিনি এই বুদ্ধিপ্রধান ভাষা প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগাতে সচেষ্ট ছিলেন। তিরিশের দশকের শক্তিমান ও বিখ্যাত কবি বলেছিলেন, 'যুক্তির বিস্তার বাংলার স্বভাব-বিরুদ্ধ।' (সুধীন্দ্র, ১৩৬৪ : ৭৬) সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-৬০) এই কথা তাঁর শিথিল মনের পরিচয় — সেটা আজো প্রমাণিত হয়নি। রামমোহন-অক্ষয়কুমার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা গদ্যে বুদ্ধির প্রাধান্য ছিল। সেই ধারা রবীন্দ্রনাথে অব্যাহত থাকেনি। তাঁর গদ্য পুরোপুরি রসসাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। প্রমথ চৌধুরী *সবুজ পত্র* প্রকাশ করে আগের ধারা পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্রিমতা ঘোচেনি। তার কারণ তিনিও কোনো গম্ভীর বিষয়ে গ্রন্থ লিখে ভাষার বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলার নজির তৈরি করতে পারেননি। ভাষা যে-কারণে জীবন্ত ও গতিশীল হয়, তার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে অসাম্য শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বীকার করতে হয়।

তবে প্রমথ চৌধুরী একটা বিষয়ে অকৃত্রিম ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে আলাদা নন। জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চায় তিনি পাশ্চাত্যের অনুরাগী কিন্তু মনে তিনি সম্পূর্ণভাবে বাঙালি। তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'ইতিমধ্যে আমার মন তিন বিদেশের—ইংলন্ড ফ্রান্স ও ইতালির—বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের হাতে ধোলাই হয়েছে। (কিন্তু) আমার পুঁথিপড়া মন সংস্কৃত-বিলেতি হলেও তার নীচে যে মন আছে তা মূলত বাঙালি।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪০২) তিনি আরো বলেছেন, 'আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে, আমার মন এ যুগের বাংলার মন।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪১২) সেকালে 'স্বদেশ প্রেম', 'স্বজাতি প্রেম', 'স্বাদেশিকতা' ইত্যাদি কথা ইংরেজি 'পেট্রিয়টিজম' শব্দ থেকে অনূদিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী এই তরজমা করবার ক্ষমতাকে মনুষ্যত্বের মহৎ অর্জন বলে মনে করতেন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে, কথায় কথায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই দিতেন বলে, স্বকালে তাঁর 'স্বদেশ প্রেম' এবং তাঁর

জাতীয়তাবাদী চেতনা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছিল। তিনি তার উত্তর যেভাবে দিয়েছিলেন তা মন দিয়ে শোনার যোগ্য। তিনি বলেছিলেন, 'আমি যে ইংরেজি লিখি নে তার থেকেই বোঝা উচিত যে অ-বঙ্গ পেট্রিয়টিজম আমার মনের উপর একাধিপত্য করে না। (...) বাঙালি বাঙালি-মাত্রেরই স্বজন, তার কারণ ভাষার যোগ হচ্ছে মানস-কায়ে রক্তের যোগ।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৪০৪) বাঙালির মনের উন্নতি, চরিত্রের উন্নতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি, অর্থনৈতিক উন্নতি তাঁর সমস্ত মন জুড়ে ছিল। ১৩২৪ সালের মাঘ সংখ্যায় *সবুজ পত্র*-এ প্রবন্ধের আকারে তাঁর এক 'পত্র' প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন,

> স্বদেশ বলতে আমি বুঝি — সেই মহাবস্তু, দেশ নামক মাটির উপর, মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে যা গড়ে তোলে। প্রথমটি হচ্ছে জড়-জগতের অন্তর্ভূত, দ্বিতীয়টি মনোজগতের একটা দেশের উপর একটা সমগ্র জাতি মিলে, নিজেদের দেহমনের বাসের জন্য যে ঘর বাঁধে, সেই ঘরই যথার্থ স্বদেশ। এ ঘরের উপকরণ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, কাব্যকলা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি; অর্থাৎ এসব উপকরণ মানুষকে নিজ মনে ও নিজ হাতে তৈরি করে নিতে হয়। এ বাসগৃহ একদিনে গড়া যায় না, এবং একবার গড়ে তারপর চিরদিন আরামে ভোগ-দখলও করা যায় না। প্রতি যুগে এর জীর্ণ অঙ্গ ভাঙ্গতে হয়। আবার নূতন অঙ্গ গেঁথে তুলতে হয়। এবং সেই জাতিকেই মানুষ কৃতী বলে—যাদের হাতে মানুষের এই স্বহস্তরচিত গৃহের উদারতা ও উচ্চতা যুগের পর যুগে ক্রমে বেড়েই চলে। (*সবুজ পত্র*, ১৩২৪ : ৫৯৯-৬০০)

এ কারণে তিনি বলেছেন, 'সাহিত্য চর্চা আমাদের পক্ষে একটা শখ নয় জাতীয় জীবন গঠনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। কেননা এ ক্ষেত্রে যা-কিছু গড়ে উঠবে তার মূলে থাকবে জাতীয় আত্মা এবং জাতীয় কৃতিত্ব।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৪০) সত্য যে, ইতিহাস তৈরি হয় জাতীয় কৃতিত্বের উপর, জাতীয় অস্তিত্বের উপর নয়। প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন, বাংলা ভাষার শক্তিবৃদ্ধি অর্থাৎ তার গৌরব ও কৃতিত্বের উপরই বাঙালি জাতির কৃতিত্ব নির্ভর করে। তাই, 'বাংলা ভাষায় আমাদের বিদ্যার সাহিত্য গড়ে তুলতে হবে, এবং সেজন্য বহু শিক্ষিত লোককে কায়মনোবাক্যে বহুদিন ধরে পরিশ্রম করতে হবে।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৩৮) এই সনিষ্ঠ পরিশ্রমের উপরই নির্ভর করবে, 'বর্তমান বাংলা নয়, অতীত বাংলাও নয়, ভবিষ্যৎ বাংলা, অর্থাৎ যে বাংলা আমাদের হাতে ও মনে গড়ে উঠছে।'—*সবুজ পত্র* এই সাধনায় নিয়োজিত ছিল আর প্রমথ চৌধুরী এই লক্ষ্য অনুসরণ করেন।

টীকা

১. প্রমথ চৌধুরীর এই ছদ্মনামটি অবশ্য খুব পরিচিতি পায়নি। প্রমথ-শিষ্য হারীতকৃষ্ণ দেব বলেন, 'ভূপেন্দ্র ছিল তাঁর রাশ-নাম আর মৈত্র ছিল তাঁর বারেন্দ্র পদবি।' (হারীত, ১৯৯৭ : ৩৫) প্রমথ চৌধুরী এই ছদ্মনামে লেখায় পাঠকদের মধ্যে একটা কৌতূহল দেখা দেয় এবং সাহিত্যিক অঙ্গনে তা জানাজানি হয়ে যায়। ফলে একটা ধারণা তখন পুরোপুরি বদ্ধমূল হচ্ছিল যে, *সবুজ পত্র*-এর লেখক-সংখ্যা নিতান্ত কম। এ ধারণা মিথ্যে ছিল না।

২. চলিত ভাষা খুব সহজে যে প্রবর্তিত হয়েছিল তা নয়। সেদিন প্রমথ চৌধুরীকে পুরাতনপন্থিদের ঘোর বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২), যতীন্দ্রমোহন সিংহ (?-১৩৪৪), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), নলিনীকান্ত ভট্টশালী (১৮৮৮-১৯৪৭), ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৬৮-১৯২৯) এবং মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক চলিত গদ্যের বিরুদ্ধে ছিলেন। চলিত ভাষার পক্ষের দুই শক্তি—রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে এই সাধু গদ্যের মুখপাত্রদের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছিল।

৩. প্রমথ চৌধুরী ও *সবুজ পত্র* বিষয়ে এ পর্যন্ত বেশকিছু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান লেখকের দেখা, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবেন্দ্র সিংহরায় লিখেছেন দুটো বই। প্রথমটির নাম *প্রমথ চৌধুরী*, প্রকাশিত হয় 'মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড' কলকাতা থেকে ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ তে; দ্বিতীয়টির নামও *প্রমথ চৌধুরী*, প্রকাশিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' সিরিজের ১১৭ নম্বর গ্রন্থরূপে, কার্তিক ১৩৮৮ সালে। রথীন্দ্রনাথ রায়ের *বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী* কলকাতার জিজ্ঞাসা থেকে প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তে; অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে, প্রকাশক সাহিত্যলোক, কলকাতা; অশোককুমার সরকার প্রণীত *সবুজ পত্র ও বাংলা সাহিত্য* প্রকাশ করে পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪ তে; ঢাকার বাংলা একাডেমি থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমানের *প্রমথ চৌধুরী : বাংলা ভাষা ও গদ্যচিন্তা*। খুবই উল্লেখযোগ্য বই অন্নদাশঙ্কর রায়ের *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্র*, প্রকাশিত হয় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে জানুয়ারি ১৯৯৯ তে। প্রমথ চৌধুরী ও *সবুজ পত্র* নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা পাওয়া যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজীবনী *চলমান জীবন* (১ম পর্ব, ১৩৫৯, ২য় পর্ব ১৩৬১) ও অমিয় চক্রবর্তীর *সাম্প্রতিক* (১৯৬৩) গ্রন্থে। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর আত্মজীবনীর একটা বিশেষ অংশ 'জীবনকথা' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় *এক্ষণ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা ১৪০০-এ। পরে বিশ্বভারতী থেকে *স্মৃতিসম্পুট* (১ম খণ্ড, ১৯৯৭, ২য় খণ্ড, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ৩য় খণ্ড, ২০০১) নামে পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশিত হয়। এতে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রমথ চৌধুরী ও *সবুজ পত্র*-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা যায় যা প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কিত। প্রমথ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে *বিশ্বভারতী পত্রিকা* ১৩৭৫ সালে শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশ করে অমিয় চক্রবর্তীর 'প্রমথ চৌধুরী', ভবতোষ দত্তের 'প্রমথ চৌধুরী', সুশীল রায়ের 'প্রমথ চৌধুরী-প্রসঙ্গ' এবং প্রণবরঞ্জন ঘোষের 'সাহিত্যের বিশ্বামিত্র : প্রমথ চৌধুরী'। শেষোক্ত প্রবন্ধটি লেখকের *ঊনবিংশ শতাব্দীর মনন ও সাহিত্য* (১৩৭৫) গ্রন্থে সংকলিত হয়। 'প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভাষা' নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন বিজিতকুমার দত্ত (দ্র. *বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা*, সমতট প্রকাশনী, কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৮৮)। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের *সবুজ পত্র* বিষয়ক আলোচনা-প্রবন্ধ 'প্রমথ চৌধুরী, সবুজ পত্র' (দ্র. *দেশ*, সাহিত্যসংখ্যা ১৩৯৭)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ কবির ঢাকা *বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*র জুন ১৯৮০ এবং জুন ১৯৮১ সংখ্যায় পরপর দুটি প্রবন্ধ—যথাক্রমে 'প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-চিন্তা' ও 'প্রমথ চৌধুরীর ভাষা-চিন্তা'— লেখেন। তাঁর এ প্রবন্ধের মতামত নিয়ে একজন অধ্যাপক তর্ক তুললে তিনি সে তর্কের জবাবেও একটি নাতিদীর্ঘ লেখা প্রকাশ করেন (দ্র. *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, জুন ১৯৮৩)। সম্প্রতি প্রমথ চৌধুরীর *অগ্রন্থিত রচনা* শিরোনামে দু-খণ্ড বই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতার মনফকিরা প্রকাশনা থেকে। সংকলক ও সম্পাদক মলয়েন্দু দিন্দা বিলক্ষণ পরিশ্রম করে যে প্রমথ চৌধুরীর প্রায় হারিয়ে যাওয়া অর্ধশত ছোট-বড় প্রবন্ধ উল্লিখিত দু-খণ্ড বইয়ে সংকলন করেছেন, তাতে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। এজন্যে মলয়েন্দু দিন্দার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার। অপরদিকে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীর *পত্রাবলী* । সংকলন ও সম্পাদনা করেন সুভাষা চৌধুরী। এ ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগের কথা উল্লেখ্য। শোনা যায়, *সেরা সবুজ পত্র সংগ্রহ* দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। আমি বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত (মাঘ ১৪০৬ সালে মিত্র ও ঘোষ প্রকাশিত) প্রথম খণ্ড দেখেছি। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত রচনা এবং তাঁর সম্পাদিত *সবুজ পত্র*-এর সব রচনাও কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হওয়া দরকার।

৪. 'সৌজন্য' শব্দটিকে আমরা সাধারণত মামুলি ধারণা হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। রবীন্দ্রনাথ এটাকে গ্রহণ করেছিলেন জীবনের একটা কেন্দ্রীয় ধর্ম বলে। প্রমাণ দেওয়া যাক। বুদ্ধদেব বসু একবার কিছুদিনের জন্যে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথি ছিলেন। সেটা ১৯৩৮ সালের কথা। রবীন্দ্রনাথের আতিথেয়তায় বুদ্ধদেব বসু এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কলকাতায় ফিরে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সে কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন, 'সৌজন্যকে বিশ্বাস করেছি—সমাজের নিয়মে নয়, অন্তরের স্বাভাবিক প্রবর্তনায়—সেটাকে আভিজাত্য বলিনে, বলি মনুষ্যত্ব।' (চিঠিপত্র ১৬, ১৪১৪ : ১৪১) 'সৌজন্য' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যায় বুদ্ধদেব বসু খুবই লজ্জা পেয়েছিলেন। রাজশেখর বসুর মৃত্যুর (২৭শে এপ্রিল ১৯৬০) পরে 'রাজশেখর বসু' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই 'সৌজন্য'-এর ব্যাখ্যা স্মরণ করে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, আসলে 'যাকে আমরা সৌজন্য বলি, বলি আতিথিয়তা, তা কোনো আলাদা বাক্সে তুলে রাখা, ছুটির দিনে বের করার মতো পদার্থ নয়—তা যদি হয় তাহলে তার মূল্য নেই—সেটা মানুষের মৌলিক মনুষ্যত্বেরই এক বিচ্ছুরণ।' (বুদ্ধদেব, ২০১০ : ২০৫) এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু স্মৃতি থেকে লিখেছেন যে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে 'সৌজন্য' বা 'কৌলীন্য' শব্দের ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি আসলে ব্যবহার করেছিলেন 'ধন্যবাদ' শব্দটি (*চিঠিপত্র* ১৬, ১৪১৪ : ১৮৪)। তবে রবীন্দ্র-মুগ্ধতায় বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন *সব পেয়েছির দেশে* (১৯৪১), সেটাও উল্লেখযোগ্য।

৫. প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা' পড়েছিলেন একটি সভায়। পত্রিকায় প্রকাশের পর সেটা খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধটি পুস্তিকা বানিয়ে এক হাজার কপি ছাপালে কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। প্রমথ চৌধুরী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন যে, 'দশ হাজার ছাপালেও বাজারে তা কাটতে সাত দিনও লাগবে না।' (প্রমথ, ১৯৯১ : ১১) অন্য একটি প্রবন্ধও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। জীবনের শেষপর্বে 'তেল নুন লকড়ি' প্রবন্ধটি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন যে, 'আমি প্রথম বয়সে 'তেল নুন লকড়ি' নামে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখি, আর সেটি যথেষ্ট লোকপ্রিয় হয়। লোকপ্রিয় যে হয়, তার প্রমাণ—উক্ত প্রবন্ধ কোনো ব্যক্তি পুস্তিকারূপে প্রকাশ করেন। আজ আবার শেষ বয়সে সেই তেল নুন লকড়ি'র ভাবনা আমার প্রধান ভাবনা হয়েছে। (প্রমথ, ১৯৯০ : ৯২) এ দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ করে বলবার কারণ এ জন্যে যে, বাঙালির সমাজ ও বাংলার কৃষকের ভাবনায় প্রবন্ধ দুটির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার্য।

৬. বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে তাঁর রচনা থেকে বাক্যগঠনের রীতি নিয়ে আলোচনা করতে চাওয়া হচ্ছে ফলের শাঁসের থেকে তার খোসার প্রতি আগ্রহ দেখানো। এরকম মনোভাবের ওপর প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গ-বাণ ছুঁড়েছিলেন এবং বলেছিলেন এরই নাম 'সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়া।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ৩৭৪)

৭. প্রমথ চৌধুরী এক চিঠিতে লিখেছেন, 'আমি জীবনে আমার একটা পথ ধরে নিয়েছি এবং ধীরে ধীরে হোঁচট খেতে খেতে সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি—এর চাইতে অবশ্য ঢের বড় বড় পথ আছে—যথা ধনের পথ, মানের পথ ইত্যাদি—কিন্তু আমি ঐ মনের পথ ধরেই চলব। এ পথের পথিকদের কপালে ঘরে বাইরে পুরস্কারের চাইতে তিরস্কারই জোটে বেশি, তাতে যারা ডরায় তাদের পক্ষে ধনের পথ ধরাই উচিত—কেননা ধনের পিছনে মান আসে। তখন তাঁরা দাবী করেন যে তাঁদের মনও খুব বড় এবং দেশশুদ্ধ সে দাবী সাগ্রহে মঞ্জুর করেন।' (হারীত, ১৯৯৭ : ২০৩-৪)

৮. বাঙালির মানসিক অবস্থা যে কী পরিমাণ শোচনীয় হয়ে উঠেছিল, সেটা লক্ষ করে *সবুজ পত্র*-এ 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধে অতুলচন্দ্র গুপ্ত মন্তব্য করেন, 'আমাদের দেশে এমন সব স্বদেশহিতৈষী আছেন যাঁদের অন্তরে এই সভ্যতার প্রতি বিন্দুমাত্রও শ্রদ্ধা নেই। তারা যে কথায় বা বক্তৃতায় এই সভ্যতায় গৌরব করেন না এমন নয়। কিন্তু কোনও আলাদীন একরাত্রের মধ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত অতীতটাকে মুছে ফেলে ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপকে

(প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইংলণ্ডকে কেননা ইংলণ্ডের বাইরের য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় নেই) একবারে গোটা দেশের উপরে বসিয়ে দিয়ে যায় তাতে তাঁরা হর্ষোৎফুল্লই হয়ে উঠবেন।' (*সবুজ পত্র*, ১৩২৬ : ৬৫)। উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক পটভূমি এবং বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালির অবহেলা ও হীনম্মন্যতায় বিরক্ত হয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত এমন কথাই বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল : 'ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে, ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহাবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশ ভাষা সকল ঐ পরভাষা বলে বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা এ কথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন।' (অক্ষয়, ২০১৪ : ৮৭)

৯. সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানুষের মধ্যে যে লোকটা বুদ্ধিমান তার দাবীর দিকে না তাকিয়ে যে লোকটা রসবিলাসী তাকে খুসি করবার চেষ্টা কোরো। বুদ্ধিমানদের জন্যে আছে আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল, White Head, প্রশান্ত, সুনীতি চাটুজ্জে—মস্ত মস্ত লোক সব—তোমার আমার মতো মানুষ রসিকসভায় রসের যোগান দেবার ভার নিতে যদি পারি তবে তার চেয়ে বেশি আশা নাই করলুম।' (রবীন্দ্র, ১৩৭৯ : ১৩৯)

১০. এ কথা আজ সুবিদিত যে, *সবুজ পত্র*-এর প্রধান লেখক ছিলেন দুজন—রবীন্দ্রনাথ আর সম্পাদক নিজে। পত্রিকা প্রকাশের শুরুর দিকে সাধারণত এই দুজনের লেখাই প্রকাশিত হতো। রবীন্দ্রনাথ এ নিয়ে কিছু অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। *চিঠিপত্র* পঞ্চম খণ্ডে, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একাধিক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অস্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন। ২৮শে জুলাই ১৯১৪ তারিখে লিখেছেন, 'সবুজপত্রে কেবলমাত্র সম্পাদক এবং একটিমাত্র লেখক যদি সব লেখা লেখে তবে লোকে বলবে কি? এক ত সেটা দেমাকের লক্ষণ মনে করে ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকবে—তারপরে হয় ত বৈচিত্র্যের অভাবেও দুঃখ বোধ করতে পারে।' (পৃ ১৮১) 'মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশি নয়। নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না। ... সেইজন্য তোমাকে আমি একটি নবীন লেখকমণ্ডলীর কেন্দ্র ও অধিনায়কের আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে ইচ্ছা করি।' (পৃ ১৮৯) 'ইতিমধ্যে সবুজ পত্রটাকে তোমরা তাজা রেখে দাও। যত পার নতুন লেখক টেনে নাও—লিখতে লিখতে তারা তৈরি হয়ে নেবে। কাগজের আদর্শ সম্বন্ধে অত্যন্ত বেশি কড়া হলে নিষ্ফল হতে হবে।' (পৃ ২১২) 'নবীন লেখক চাই। তাদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন? সবুজপত্রের সভার পনেরো আনা আসন আমরাই যদি জুড়ে থাকি তাহলে কাল-ব্যতিক্রম দোষ ঘটে।' (পৃ ২৫৯) 'সবুজ পত্র পড়ে খুব খুশি হলুম। কিন্তু আরো লেখক চাই। লেখাসৃষ্টির চেয়ে লেখকসৃষ্টির বেশি দরকার। লেখাসৃষ্টির দ্বারাই লেখককে টানা যায় কিন্তু এখনো বেশি দূর পর্য্যন্ত সবুজপত্রের টান পৌঁচেচ্চে না। নবীন লেখকেরা সবুজপত্রের আদর্শকে ভয় পায়—তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।' (পৃ ২৬০)

১১. প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্তের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ব্যারিস্টার ও রাজনীতিক কিরণশঙ্কর রায় (১৮৯১-১৯৪৯)। তিনি ছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্তের শ্যালক। প্রমথ চৌধুরীর *আত্মকথার* ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত নিজের সম্পর্কে লিখেছেন যে, 'প্রমথবাবুর সঙ্গে পরিচয় ও তাঁর সাহচর্য্য আমার জীবনের সম্পদ। তা না ঘটলে সম্ভব জীবিকার্জনের উৎসাহে, লোকে যাকে বলে *কাজ* তাতে ডুবে যেতাম। আমি বাংলা সাহিত্যে দু ছত্রের নগণ্য লেখক। কিন্তু সে লেখাও লিখতেম না প্রমথ বাবুর সঙ্গে পরিচয় না হ'লে।' প্রমথ চৌধুরী আর অতুলচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতার জন্ম হয় তা ছিল একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত। পরিণত বয়সে তাঁরা কেউ কাউকে না-দেখে এক সপ্তাহ কাটাতে পারতেন না। অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯) লিখেছেন যে, 'প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্রের পরিচয় অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হয়েছিল। একে অন্যকে না দেখে একদিনও

থাকতে পারতেন না। হয় প্রমথ চৌধুরী অতুলবাবুর বাড়ি আসতেন, না হয় অতুলবাবু প্রমথবাবুর বাড়ি যেতেন।' (অজিত, ২০০০ : ১৬৫) এই একই কথা লিখেছেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর *তে হি নো দিবসাঃ* নামক আত্মজীবনীতে (সুবোধ, ১৯৮৪ : ১৪২)। প্রমথ চৌধুরী বই পড়া প্রবন্ধে লিখেছেন, 'মার্জিত রুচি, পরিষ্কৃত বুদ্ধি, সংযত ভাষা ও বিনীত ব্যবহার মানুষকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে এবং সম্ভবত চিরকাল করবে।' (প্রমথ, ১৯৭৪ : ১৪৭-৮) অতুলচন্দ্র গুপ্তের বিদ্যার চেয়ে তাঁর মধুর ব্যবহার প্রমথ চৌধুরীকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিল। বাংলা সাহিত্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত *কাব্যজিজ্ঞাসার* (১৩৩৫) লেখক বলে পরিচিত। অবশ্য এ গ্রন্থে তিনি প্রাচীন আলংকারিকদের রসতত্ত্বের যে বিচার করেছেন, তাঁর আগে তেমন করে কেউ তা করতে পারেননি। প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই বইয়ের কথা তাঁর *প্রবন্ধসংগ্রহ*-এর একাধিক প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভাষায় উল্লেখ করেছেন। প্রমথ চৌধুরী নিজেও ছিলেন ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্বের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ও অনুরাগী। এ ব্যাপারে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের থেকে ছিলেন ব্যতিক্রম। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সাহিত্য-তত্ত্বকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্বের তুলনায়। প্রমথ চৌধুরী ঠিক এর উলটো ছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণা থেকেই অতুলচন্দ্র গুপ্তের *কাব্যজিজ্ঞাসার* জন্ম হয়। *শিক্ষা ও সভ্যতা* (১৩৩৪), *নদীপথে* (১৩৪৪), *জমির মালিক* (১৩৫১), *সমাজ ও বিবাহ* (১৩৫৩), *ইতিহাসের মুক্তি* (১৩৬৪) অতুলচন্দ্র গুপ্তের মূল্যবান গ্রন্থ। সম্প্রতি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। এতে তাঁর অধিকাংশ রচনা থাকলেও অনেক মূল্যবান লেখা স্থান পায়নি। অজিত দত্তের উক্ত প্রবন্ধে তিনি কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ (১৮৮৯-১৯৭৩)-এর একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। তাতে দেখা যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে এক দলিলে নির্দ্বিধায় স্বাক্ষর করছেন। অথচ তিনি তখন ছিলেন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি'র অন্যতম সভ্য। তিনি যেমন ব্যক্তি-স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন, তেমনি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায়।

১২. ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর অনেক গুণ ছিল। সেটা হয়তো তিনি বিরাট পরিবারে জন্মেছিলেন এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪২-১৯২৩) কন্যা বলে। অপরদিকে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে বিয়ে হওয়াটাও একটা কারণ। সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ এক নারী। তাঁর একটি বই—*নারীর উক্তি* (১৯২০) — যাতে সাতটি প্রবন্ধ— 'বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার বিচার', 'সমালোচকের পত্র', 'সম্বন্ধ', 'আদর্শ', 'ভদ্রতা', 'গ্রীস ও রোম', 'পাটেল বিল' ছিল মূল্যবান। এ বইয়ের সব প্রবন্ধই *সবুজ পত্র*-এ প্রকাশিত হয়েছে। *বাংলা স্ত্রী-আচার* (১৩৬৩) ও *পুরাতনী* (১৩৬৪) তাঁর সম্পাদিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই। প্রথমটি বাংলার লোকসংস্কৃতির উৎস-সন্ধানে এক আকরগ্রন্থ; দ্বিতীয়টি বাংলায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে তাঁর পিতা-মাতার ব্যক্তিগত লড়াইয়ের ইতিহাস। কেননা এ বইতে আছে তাঁর মা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (১২৫৮-১৩৪৮) আত্মকথা ও তাঁর মাতাকে লেখা পিতার চিঠিপত্রের সংকলন।

১৩. প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জানাশোনা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হলে প্রমথ চৌধুরী আবার সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অত্যন্ত গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন এবং *বিশ্বপরিচয়* (১৩৪৪) সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গপত্রে 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু' উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'এই বইখানি তোমার নামের সঙ্গে যুক্ত করছি। বলা বাহুল্য এর মধ্যে এমন বিজ্ঞানসম্পদ নেই যা বিনা সংকোচে তোমার হাতে দেবার যোগ্য। তা ছাড়া, অনধিকার-প্রবেশে ভুলের আশঙ্কা করে লজ্জা বোধ করছি, হয়তো তোমার সম্মান রক্ষা করাই হল না। কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ সামনে রেখে সাধ্যমত নিড়ানি চালিয়েছি। কিছু ওপড়ানো হল। যাই হোক, আমার দুঃসাহসের দৃষ্টান্তে যদি কোনো মনীষী, যিনি একাধারে সাহিত্যরসিক ও বিজ্ঞানী, এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে নামেন, তা হলে আমার এই চেষ্টা চরিতার্থ হবে।' সত্যেন্দ্রনাথ বসু সবুজপত্রগোষ্ঠী-ভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু *সবুজ পত্র*-এ লেখেননি। তবে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' (১৯৪৮) থেকে

জ্ঞান ও বিজ্ঞান (১৯৪৮) পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি তাতে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-বিষয়ক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, সেগুলোতে প্রমথ চৌধুরীর আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বিজ্ঞান বিষয়ক বাংলা রচনাগুলো তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' থেকে *সত্যেন্দ্রনাথ বসু : রচনা সংকলন* (১৩৮৭) নামে প্রকাশিত হয়।

১৪. এ বই সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এর চারটি সংস্করণ উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়েছিল। বাংলা ভাষায় এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের দ্বিতীয় অনুবাদক হচ্ছেন সরদার ফজলুল করিম (১৯২৫-২০১৪)। ননীমাধব চৌধুরী তরজমা করেছিলেন মূল ফরাসি থেকে আর সরদার ফজলুল করিম করেছিলেন ইংরেজি থেকে। ননীমাধব চৌধুরী বাংলা তরজমায় বইয়ের নাম রেখেছিলেন *সামাজিক চুক্তি*, সরদার ফজলুল করিম *রুশোর সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট* (২০০০)।

১৫. লেখক ও গ্রন্থকার সম্পর্কে আমার মতো অনেক সাধারণ পাঠকের বিশেষ কোনো ধারণা নেই। শুধু তাই নয়, আজকাল যাঁরা লেখালেখি করেন, তাঁরাও বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য *সংস্কৃতি*, নভেম্বর ২০১৪।

গ্রন্থপঞ্জি

অক্ষয়কুমার দত্ত, ২০১৪। *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* (মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম সম্পাদিত), কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

অজিত দত্ত, ২০০০। *প্রবন্ধসংগ্রহ*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

অন্নদাশঙ্কর রায়, ১৯৯৯। *রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও সবুজ পত্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

আবু সয়ীদ আইয়ুব, ১৯৯২ । *পথের শেষ কোথায়* (চতুর্থ সংস্করণ), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জাঁ জাক রুশো, ১৯৯৫। *সামাজিক চুক্তি* (ননীমাধব চৌধুরী অনূদিত) (চতুর্থ সংস্করণ), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি।

প্রমথ চৌধুরী, ১৯৭৪। *প্রবন্ধসংগ্রহ* (ভূমিকা, অতুলচন্দ্র গুপ্ত) বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

১৪১২। *গল্পসংগ্রহ* (ভূমিকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

১৯৯০। *রবীন্দ্রনাথ*, (রণজিৎকুমার সম্পাদিত) প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা।

২০০৮। *ঘরে বাইরে*, মনফকিরা, কলকাতা।

১৩৫৩। *আত্মকথা*, দি বুক এম্পরিঅম লিমিটেড, কলকাতা।

১৪১৪। *আত্মকথা*, মনফকিরা, কলকাতা।

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৯৭ । *কালের পুতুল* (তৃতীয় সংস্করণ), নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২০১০। *প্রবন্ধসমগ্র* ৩ (প্রধান সম্পাদক, নরেশ গুহ), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০০। *চিঠিপত্র* ৫ (পুনর্মুদ্রণ), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

১৯৯৩। *চিঠিপত্র* ৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

১৩৯৩। *চিঠিপত্র* ১৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ১৪০৫। *রচনা সংকলন* (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৬৪। *কুলায় ও কালপুরুষ*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, ১৯৮৪। *তে হি নো দিবসাঃ*, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

হারীতকৃষ্ণ দেব, ১৯৯৭। *সবুজপাতার ডাক*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

প্রবন্ধাবলি

অতুলচন্দ্র গুপ্ত, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৪। 'প্রমথ চৌধুরী', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কলকাতা।

বৈশাখ ১৩২৬। 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী', *সবুজ পত্র*, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, কলকাতা।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত, জানুয়ারি ১৯৯৯। 'বাংলা গদ্যের ভূমিকা', *চতুরঙ্গ থেকে* (সম্পাদক, অশোক মিত্র), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।।

অমলেশ ত্রিপাঠী, ৬ই নভেম্বর ১৯৯৩। '*দেশ*—পটভূমিকা, আদর্শ, রূপায়ণ', *দেশ*, কলকাতা।

অম্লান দত্ত, বৈশাখ ১৩৮৮। 'ভাষার সাধনা', *বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা*, (অরুণকুমার বসু, মুখ্য সম্পাদক) সমতট প্রকাশনী, কলকাতা।

নরেশ গুহ, জানুয়ারি ১৯৯৯। 'প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ', *চতুরঙ্গ থেকে* (সম্পাদক, অশোক মিত্র), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রমথ চৌধুরী, মে ১৯৯১। 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র' (পত্রপরিচিতি, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়), *আকাদেমি পত্রিকা*-৪, কলকাতা।

মাঘ ১৩২৪। 'চিঠি', *সবুজ পত্র*, ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, কলকাতা।

পৌষ ১৩২৫। 'দেশের কথা', *সবুজ পত্র*, ৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, কলকাতা।

ভাদ্র ১৩২৭। 'অভিভাষণ', *সবুজ পত্র*, ৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৯। 'পত্রাবলী', *দেশ*, কলকাতা।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, কার্তিক ১৩২৬। 'বীরবল', *প্রবাসী*, কলকাতা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৬। 'কবি ও কাব্য : রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে', *বিশ্বভারতী পত্রিকা*, কলকাতা।